আর্থিক প্রসঙ্গ

দশম বর্ষ • অষ্টম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৬৮] • [সেপ্টেম্বর-অক্টোবর • ১৯৬

সুঠাম সুন্দর দেহ

গড়ে তুলতে

লক্ষ্মীঘি

অপরিহার্য্য

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী • কলিকাতা-১২ • ফোন ২২-৭২৩৩

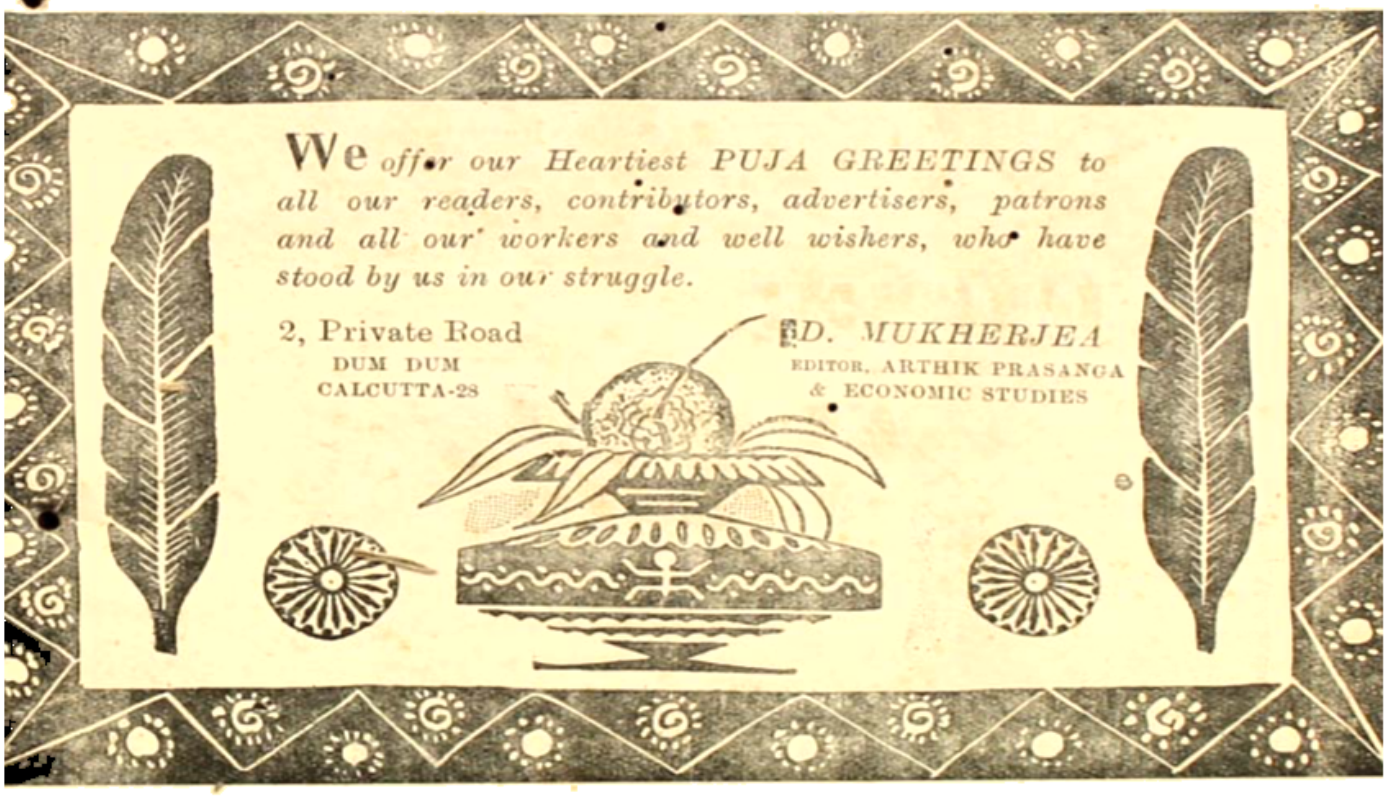
We offer our Heartiest PUJA GREETINGS to all our readers, contributors, advertisers, patrons and all our workers and well wishers, who have stood by us in our struggle.
2, Private Road
DUM DUM
CALCUTTA-28
D. MUKHERJEA
EDITOR, ARTHIK PRASANGA
& ECONOMIC STUDIES

ORISSA

TEXTILE MILLS LIMITED

Manufacturers of quality and inexpensive grey, dyed, bleached and mercerised Dhotis, Sarees, Voiles, Mulls, Poplins, Shirtings, Long Cloth, Sheetings, etc.

Mills—Chowdar, Cuttack

Calcutta Office—33 Chittaranjan Avenue, Calcutta 12

আর্থিক প্রসঙ্গ

দশম বর্ষ ঃ অষ্টম সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্বিন ঃ ১৩৬৮

সেপ্টেম্বর—অক্টোবর ঃ ১৯৬১

প্রকাশক

ইকনমিক স্টাডিজ এণ্ড জার্নালস্ প্রাইভেট লিমিটেড,

২, প্রাইভেট রোড, দমদম, কলিকাতা-২৮

ফোন ঃ ৫৭-২২৮৮

এই সংখ্যার মূল্য. দুই টাকা

PAPER

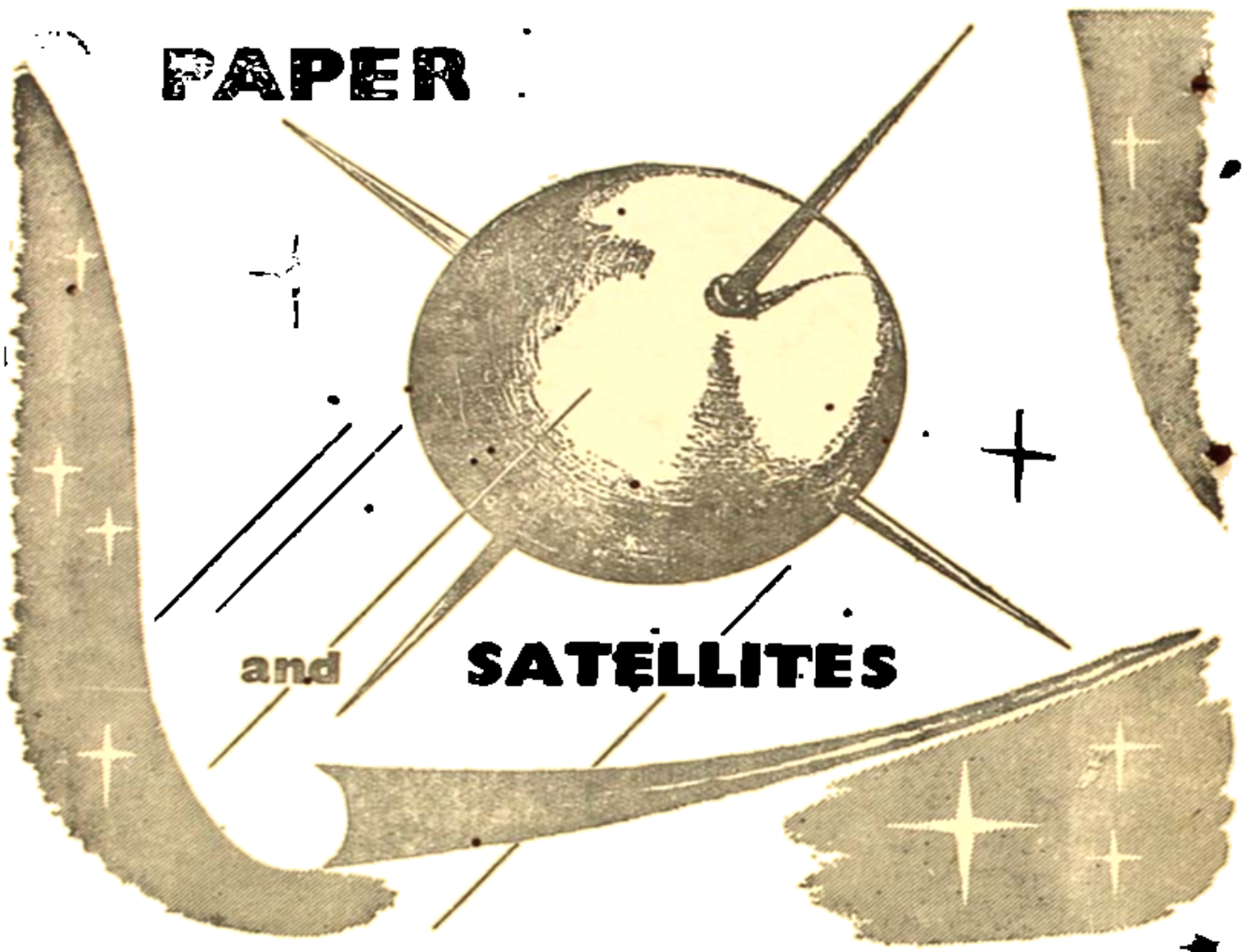

and SATELLITES

It's no exaggeration at all to say that you can hardly think of launching a satellite without paper ! There are endless calculations to be made, scientific data to be computed and analysed, drawings and blue prints to be produced and countless other things to be done—all of which take reams and reams of paper.

ORIENT PAPER MILLS LTD.

In the modern world, paper is indispensible : without it, humanity can subsist on a level only slightly better than the primitive.

BRAJRAJNAGAR, ORISSA.

Telephone : Office : - 33.8008
Barrackpore-11

Gram : BAKATEX

SWADESHI INDUSTRIES LIMITED

142A, Jamunalal Bajaj Street,
CALCUTTA-7

Mill at-Panihati, 24-Parganas, West Bengal.

TEXTILE SECTION

Manufacturers of *VELVET*, Art-silk Fabrics, Superfine Cotton Dhoties and Sarees, also Printing and Flock Printing a speciality.

RE-ROLLING MILLS

Manufacturees of Mild Steel Rods, Flats, Angles, Channels etc. both tested and untested.

BAKELITE SECTION

Manufacturers of well-known Brand of 221-*INDIA* Bakelite Electrical Accessories such as Switches both Porcelain and Bakelite, Ceiling, Rosps, Holder, Cut-outs, Plugs etc., conforming to I. S. & B. S. Specifications.

ARTHIK PRASANGA

EDITORIAL COUNCIL

Principal Sri Khagendranath Sen, President.
Prof. Sris Chandra Das, Vice-President.
Prof. Alak Ghosh
Prof. Prabhat Sarbadhikary.
Sri Umapada Majumdar.
Prof. Dwijendranath Mukherjea, Editor.
Associated Editors :
Sri Achal Bandopadhyaya. Sri P. Banerjee. Sri P. Agarwala

ADVISORY BOARD

Prof. Rabindranath Sengupta. City College & Calcutta University.
" Biswanath Mukherjee, Maharaja Manindra Chandra College.
" Jitendra Krishna Mitra, Calcutta University.
" Akshayjiban Basu. Bangabasi College.
" Shyamsundar Banerjee, Vidyasagar College.
" Sudin Bhattacharya, Victoria & City College.
" Arun Banerjee, City & Scottish Church College.
" D. P. Choudhuri, City College.
" Benoy Sarker, City College.
" Kastur Chand Lalwani, Institute of Technology, Khargpur.
" Swadesh Bhusan Bhuniya, City College.
" Himanshu Roy, City College.
" Anath Bandhu Dutta. Goenka College of Commerce.
Sri Mukunda B. Mitra, Asstt. Editor, Amrita Bazar Patrika.
" Rabindra Nath Bhattacharya Asst. Editor, Municipal Gazette.
" Hemaranjan Basu.
Prakriti Ranjan Bhadhuri.

PATRONS OF ARTHIK PRASANGA

Dr. Benode Behari Dutta
Sri Benoyendranath Banerjea.
Sri Arun Kumar Sen, Principal, City College, Commerce Department
Member of the Senate, Calcutta University.
Sri Satish Chandra Sen, Vice Principal, Vidyasagar College, Com. Dept.
Sri Sockamal Kanti Ghose, Amrita Bazar Patrika.
Sri Bimal Chandra Sinha Minister, Land Revenue, West Bengal.
Sri S. C. De, President, Federation of Small & Medium Industries.
Sri B. K. Bhattacharya, Director, Union Drug Co. Ltd.
Sri S. Maitra, Managing Director, Sulekha works Ltd.
Sri Kesabeshwar Basu, Member, Academic Council, Cal. University.
Sri T. Ghose, Director, Bureau of Industrial Statistici.
Dr. Dasbrathi Banerjee, General Manager, National Rubber Manufacturers.
Sri J. P. Poddor,

শরতের শোভাযাত্রা ... চলুন মেলামেশার মহোৎসবে

এই মহোৎসব আজ
শরতের পথে অগ্রসর।
সকলের কর্তব্য সানন্দচিত্তে যোগদান।
তার জন্য এখুনি প্রস্তুত হতে
হবে। নতুন বেশে সাজতে হবে।
নতুন জুতোয় চলতে হবে। সেরা
জুতো পাবেন বাটার দোকানে।
শরদোৎসব এখানে বিচিত্র আয়োজন।

মনে রাখবেন, দিন যত যাচ্ছে-
জিনিস তত যাচ্ছে। সুতরাং আসুন
সকালের দিকে। সকালের বাজার
—আরামের বাজার।

Bata

দি ন্যাশনাল সুগার মিলস্ লিমিটেড

মিল্‌স :
আহ্‌মদপুর, বীরভূম
পশ্চিমবঙ্গ

রেজিষ্টার্ড অফিস :
১৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,
কলিকাতা-১৩

বৈশিষ্ট্য

১। আহ্‌মদপুরের এই চিনি কলটিই উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রথম বিদ্যুৎ-চালিত এবং সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সজ্জিত চিনি কল। ভারতে আমদানীকৃত চিনির কলের এইটিই সর্বশেষ আমদানী।

২। এই কলটির স্বাভাবিক মরশুমে চিনি উৎপাদনের ক্ষমতা দুই লক্ষ হইতে আড়াই লক্ষ মণ।

৩। ১৯৬০-৬১ সালে এই কলটির প্রথম স্বাভাবিক উৎপাদন আরম্ভ হয় এবং প্রায় ৭৯০০০ মণ সাদা ও দানাদার চিনি উৎপাদিত হয়।

৪। এই কলটিতে ১৯৬০-৬১ সালে ইক্ষু হইতে চিনি প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৯·৮৫ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ও উত্তর বিহার, পূর্ব ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পণ্ডিচেরী, উড়িষ্যা ও আসাম রাজ্যের কোন চিনি কলে এত অধিক হার পাওয়া যায় নাই।

৫। পরবর্তী উৎপাদন মরশুম ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে সুরু হইবে এবং আশা করা যায় এই মরশুমে দেড় লক্ষ টনের অধিক চিনি প্রস্তুত করা যাইবে।

এম, এন, মিত্র
ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

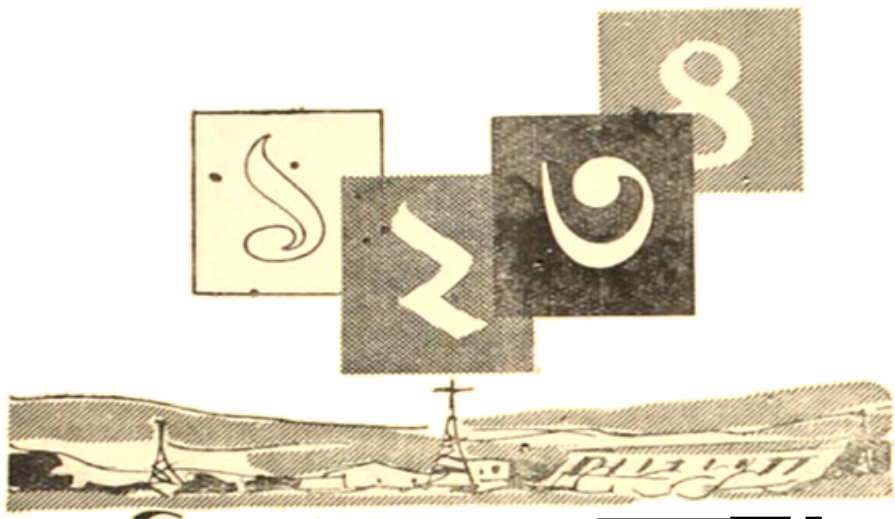

পরিকল্পনার সাহায্যকল্পে

ব্যয়ই করুন চাই সঞ্চয়ই করুন, ব্যাঙ্কের মারফত করুন। তাহলে পঞ্চবার্ষিক যোজনাসমূহের সাহায্যকল্পে আমাদের চেষ্টা অধিকতর কার্যকরী করা হবে।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস: ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সেবার প্রতীক

ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ হয়

UBE-68-61

SUPER EXPRESS CARGO SERVICE

CARRY YOUR CARGO BY OUR FLEET OF NINETEEN MODERN FREIGHTERS WHICH OFFERS YOU FAST, REGULAR AND DEPENDABLE SERVICE BETWEEN :

- INDIA—U.K. & CONTINENT
- INDIA/EAST PAKISTAN—SOUTH AMERICA
- INDIA—BLACK SEA & EASTERN MEDITERRANEAN PORTS
- INDIA—POLAND

Also around the Indian coast.

INDIA STEAMSHIP COMPANY LIMITED

MANAGING AGENTS :
LIONEL EDWARDS PRIVATE LTD.
"INDIA STEAMSHIP HOUSE"
31, OLD COURT HOUSE STREET,
CALCUTTA-1.

র‍্যালে

গত ৭৫ বছর ধরে সাইকেলের তালিকায়
শীর্ষতম নাম

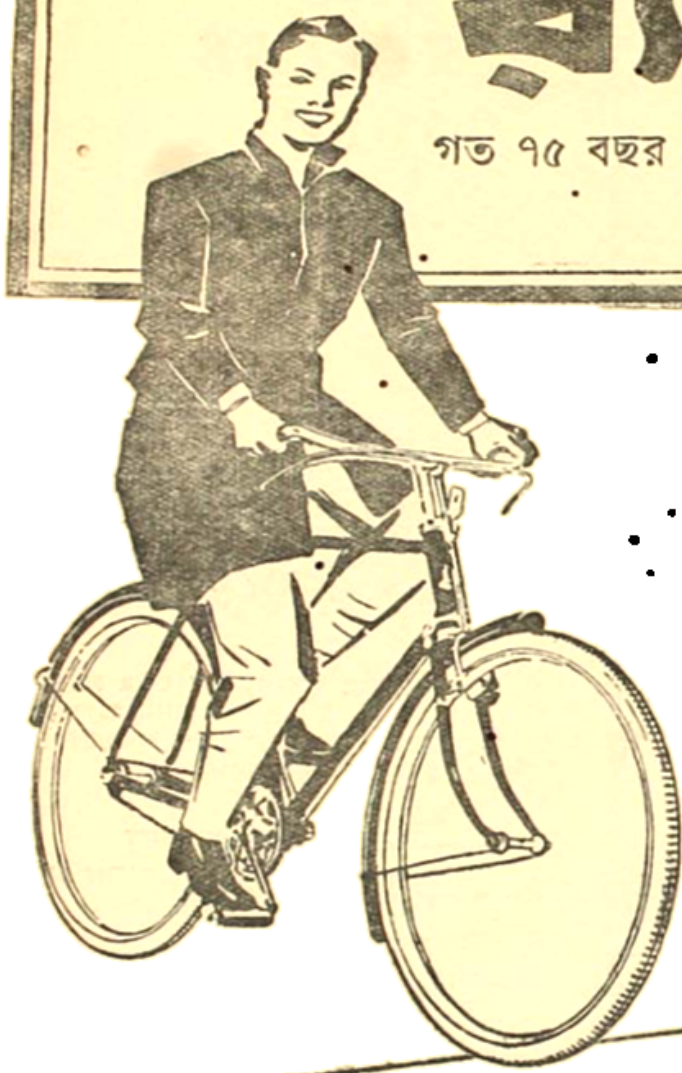

১৮৮৬ সাল থেকেই র‍্যালের শ্রেষ্ঠত্ব
সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের
দ্বারা পরীক্ষিত ও স্বীকৃত।
গত ৭৫ বছর ধরে নানা রকম
পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে র‍্যালে
ক্রমাগতই উন্নততর হ'য়ে উঠছে।
আজ তাই আগের তুলনায়
সব চাইতে উন্নত যে র‍্যালে আপনি
পাচ্ছেন তা' গুণে অতুলনীয় এবং
কাজের দিক থেকে সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাট।

র‍্যালে কেনা সব সময়ই লাভজনক

SEN RALEIGH

অধিকতর আরামের জন্য
উইট্‌কপ
সীট নাগান

সেন-র‍্যালে

SRC-45 BDN

আর্থিক প্রসঙ্গ

দশম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা] ঃঃ [আশ্বিন, ১৩৬৮

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শতাব্দীর ভাবধারায় বাঙালীর শরৎ-উৎসব	৪৩৩
রেলগ্রেড সম্মেলন—অধ্যাপক মুকুন্দবিহারী মিত্র	৪৩৬
ভারতে পরিকল্পনা রচনার নীতি—শ্রীপি, এন, লোকনাথন	৪৪০
অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা—অধ্যাপক শ্রীরাখালচন্দ্র দত্ত	৪৪১
ভারতে তৃতীয় পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী—সমীক্ষক	৪৪৫
রূপরেখার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—শ্রীঅচল বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪৯
তৃতীয় পরিকল্পনার রেখাচিত্র	৪৫৭
ভারতে ভূ-আর্থিক শাসনাকল—অধ্যাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী	৪৭৩
সমবায়ী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মূল্য ও মুনাফা-নীতি—অধ্যাপক শ্রীপ্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৮১
কৃষিপণ্যের বাজার প্রসঙ্গে—অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ	৪৮৫
আর্থিক মূল্যায়ন ও ভারতীয় অর্থনীতি—অধ্যাপক শ্রীঅমরনাথ দত্ত	৪৯১
ব্যাঙ্ক আমানতের নিরাপত্তা—অধ্যাপক শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত	৪৯৭
আগামীকালের শিক্ষণ ব্যবস্থা—শ্রীএল, এন, মিশ্র	৫০২
যৌথ কোম্পানী প্রসঙ্গ	৫০৯
জীবন বীমা প্রসঙ্গ	৫১১

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে

ইস্ট ইণ্ডিয়া পেণ্ট য়্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা : আসানসোল : শিলিগুড়ি : মাদ্রাজ

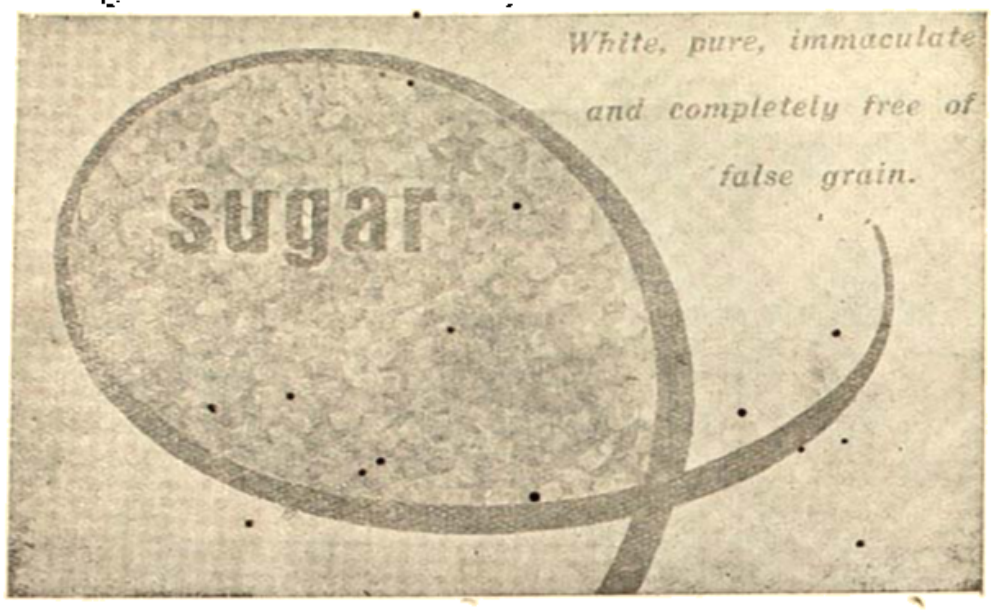

THE MOTIPUR SUGAR FACTORY
P. O. Motipur, Dist. Muzafferpur
ABDUL RAHIM OOSMAN & CO. (INDIA)
PRIVATE LTD.
2, Rajmohan Street, Calcutta-1

সর্ব ঋতুতে সর্ব উৎসবে
বাংলার শাম

•সেই সঙ্গে কুটির ও গ্রামীন শিল্পের
বিরাট সমাবেশ
•পূজা উপলক্ষে রিবেট ছাড়াও বিশেষ
কমিশন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পবিকাশের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় ও
[illegible] সহযোগিতায় পরিচালিত

পশ্চিম বঙ্গ •
রেশম শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ

প্রধান কার্যালয় ও বিক্রয়কেন্দ্র : ১২।১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
বিক্রয়কেন্দ্র :—(১) ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড্, কলিকাতা-৭
(২) ১৪৯।১।এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯
(৩) কুটীর শিল্প বিপণি, ১১৩।এ এস্প্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-১ •

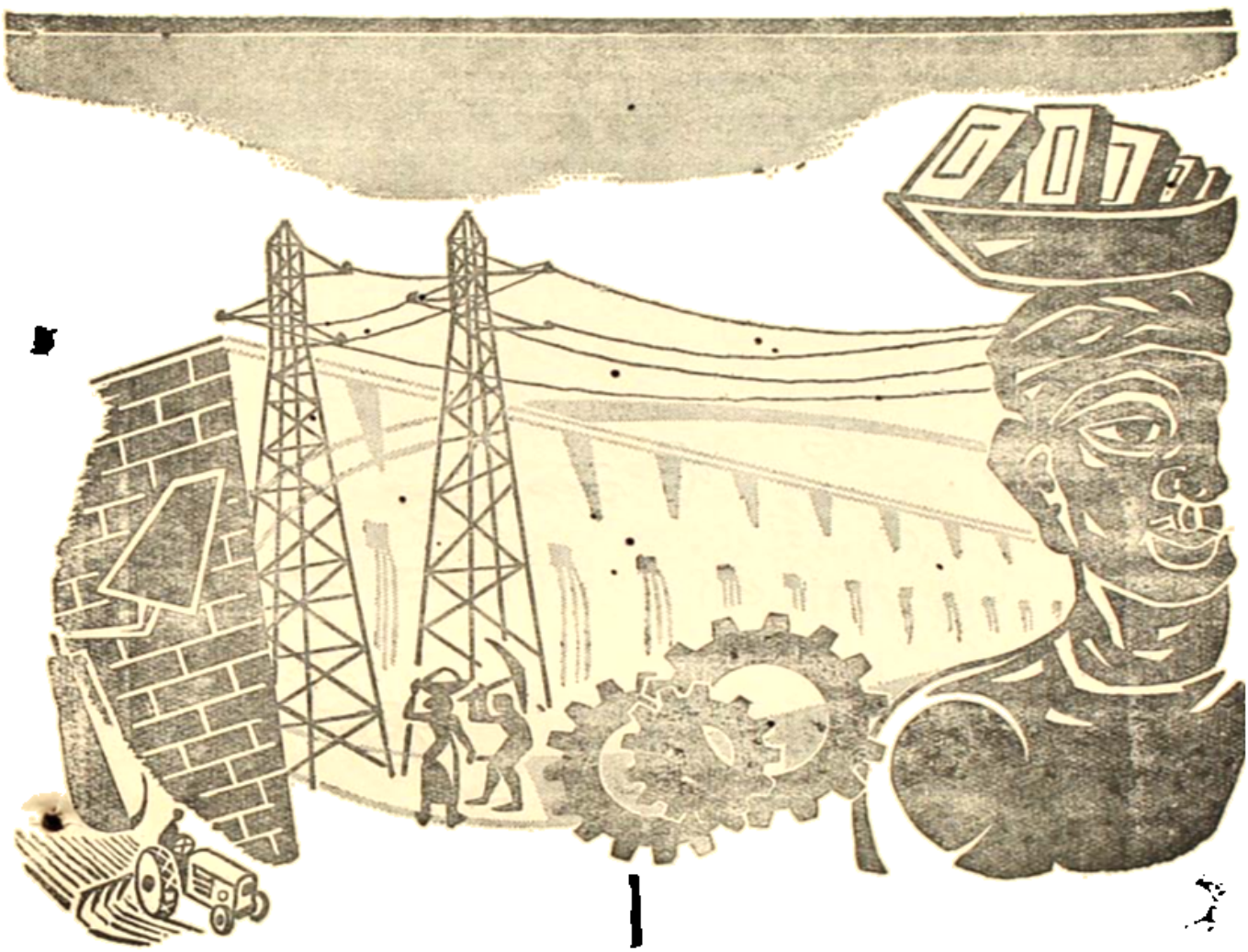

অগ্রগতির পথে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প প্রসার এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোকে দৃঢ় করবার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যথাক্রমে প্রায় ৭২ কোটি ও ১৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও এই সর্বাঙ্গীন উন্নতি-প্রচেষ্টা সমভাবে চালিয়ে যাওয়া হবে। এই নূতন পরিকল্পনা অনুসারে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে—কৃষি ও আনুষংগিক বিষয়সমূহ বাবদ ৭৬·৮৭ কোটি টাকা ; সমবায় ও সমষ্টি উন্নয়নের জন্য ২৩·৩৬ কোটি টাকা ; বিদ্যুৎশক্তি ও সেচ বাবদ ৫৭·৮৬ কোটি টাকা ; শিল্প ও খনি ১৩·০৪ কোটি টাকা ; পরিবহণ ও যোগাযোগ ২৬·৫০ কোটি টাকা ; সমাজসেবা ৮৯·০১ কোটি টাকা ; অন্যান্য খাতে ৫৪·১৬ কোটি টাকা ; মোট ৩৪১·৩০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়িত করে উন্নতির পথে আমরা আরো এক ধাপ এগিয়ে গড়ে তুলবো—

সোনার বাংলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

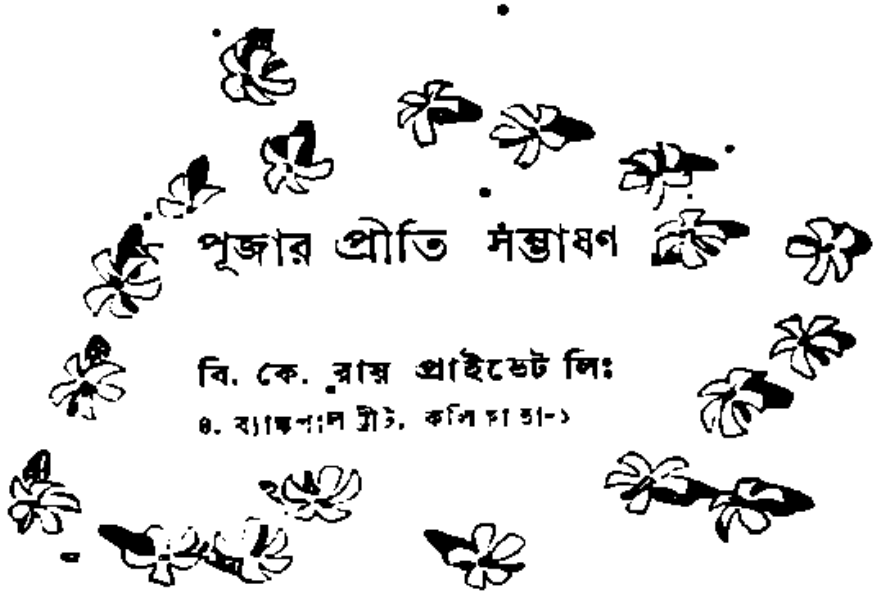
পূজার প্রীতি সম্ভাষণ
বি. কে. রায় প্রাইভেট লিঃ
৪, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

মাসিক প্রসঙ্গ

দশম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা] [আশ্বিন, ১৩৬৮

শতাব্দীর ভাবধারায় বাঙালীর শরৎ-উৎসব

মাটি ও মানুষের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। অবণাতীত কাল হইতে মানুষ মাটিকে ভিত্তি করিয়া সঞ্চরণ করিয়াছে দেশ হইতে দেশান্তরে সীমা-পরিধি অতিক্রান্ত করিয়া যেখানে সে জীবনধারণের অপর্যাপ্ত ও অনায়াসলব্ধ উপাদান পাইয়াছে, সেখানেই সে প্রাচুর্যের পরিতৃপ্তিতে, প্রাণশক্তির স্বচ্ছন্দ্য স্ফুরণের উজ্জ্বল প্রবাহের ধারায় নিজেকে বিকশিত করিয়াছে, সিক্ত করিয়াছে সমাজ জীবনকে, সিঞ্চিত করিয়াছে সমাজ জীবনের গতিপথকে, প্রকাশের অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপকে।

বাঙলা দেশের এমনি একটি জীবনযাত্রার পটভূমিকায় শরৎ উৎসবের সার্থকতা উপলব্ধি করা যায়। তখন সমাজ-ব্যবস্থায় এমন জটিলতা ছিল না, রাজনীতি বনাম অর্থনীতির নিষ্ঠুর নিগড়ে সমাজ কোথাও এমন জড়সড়, কোথাও বা এমন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "নব নব শতাব্দীতে নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্মাবমান স্নেহকুঞ্জে আমাদের আম-কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী খনন চলিতেছে, গুরু মহাশয় শুভঙ্করী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণ পাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লী প্রাঙ্গন মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।"

আজ সর্বজনীন, বিস্তৃত, বৃহত্তর সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে যুগোপযোগী চিন্তাধারার বিকাশও দেখা দিতেছে। যুগের পরিবর্তনে অন্তর আজ বাহিরের চাপে হৃদয়ের পরিধির বাহিরে

আসিয়া জন-মানসের নিকট ব্যাকুল হইয়া ফিরিতেছে। শতাব্দীর ভাবধারায় মনের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূজা উৎসবের সেই ভাবটিও রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। তথাপি বাঙালীর, বাঙালীর পূজা উৎসবের সর্বব্যাপক, সর্বাত্মক ভাবটি এখনও লুপ্ত হয় নাই। বাঙালীর একক পূজা, গৃহ অঙ্গনের পূজা, সকলের প্রাঙ্গনে আসিয়া সর্বজনীনত্ব লাভ করিয়াছে। যে যেমন পারে, সে তেমনি আগ্রহে, প্রচেষ্টায় উৎসবের সাজ-সজ্জায়, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্বজনীন পূজা মণ্ডপকে, সর্বজনীন ভাবের, ভক্তির, শ্রদ্ধা-বিনিময়ের মিলনের এক অপূর্ব ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত করিয়াছে।

"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥"

দেশের বিস্তৃত হৃদয়কে এক করিবার উদ্দেশ্যে হৃদয়ের এমন বিস্তৃত বিকাশ বোধহয় বাঙলা ছাড়া অন্যত্র কোথাও দেখা যায় নাই। পরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজনে, অগ্রগতি প্রবণ সভ্যতার ক্ষেত্রে বাঙালীর উৎসবের এই বিকাশ, বাঙালী মনেরই স্বতঃ-উৎসারিত অভিব্যক্তি।

এই অভিব্যক্তির আমরা দুইটি দিক লক্ষ্য করি,—একটি আত্মনিবিষ্ট ব্যক্তিমনের গভীর অনুভূতি প্রসূত, অপরটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ঊর্ধ্বে ও অতীতে মানব মনের একটা সামগ্রিক উদার অভিব্যক্তি। যেখানে মানুষ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে আত্মনিবিষ্ট, সেখানে আপন পরিবেশে আত্মীয় স্বজনের মিলন-মধুর আবেষ্টনে নিজেকে সার্থক করিয়া দেখিতে চায়। ইহার অন্তরালে ও ঊর্ধ্বে যেখানে সে সামগ্রিক অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ, সেখানে সে সর্বজনীন বৃহত্তর সমাজকে উপলব্ধি করে। সেই জন্যই বাঙ্গালীর পূজা ব্যক্তির উৎসব-আড়ম্বর নহে, ভোগ-বিলাসের নির্লজ্জ প্রকাশ নহে, সমাজের সকলকে একত্র করিয়া পাইবার জন্যই ইহা যেন সমষ্টি সম্মিলন। সেখানে সমাজতন্ত্র যতখানি সাম্যবাদ স্বতঃস্ফূর্তরূপে বিকশিত হইয়াছে, যতখানি শ্রদ্ধা, বিনয়, অনুরাগ ও অকৃত্রিম স্নেহবন্ধন আন্তরিক একতা সৃষ্টি করিয়াছে, সমাজে মৈত্রী বন্ধন যতখানি সুদৃঢ় করিয়াছে, আজিকার তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিজ্ঞের পুঁথিগত থিওরি তাহার তুলনায় কিছুমাত্র সার্থক হয় নাই।

বাংলার উৎসব অনুষ্ঠানের পটভূমিকায় যে সমাজ ব্যবস্থা একদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে শুধু বাঙ্গালী মনের উৎসব প্রিয়তা সার্থক লাভ করে নাই, সমগ্র বাঙ্গালী সমাজে একটা সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল; সেখানে যোগান ও চাহিদার নির্মম কচ্‌কচি ছিলনা অথচ স্থিতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামো বিরাজ করিত। আজ পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে পাই, বাংলার প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমনই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, যাহাকে আজ কুটীর শিল্পের উন্নতি, ভূমিসংস্কার, কারিগরী শিক্ষাকর্মের কৃষি পরিবর্তন, নানাবিধ প্রচেষ্টা সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত হইয়াও সফল হইতে পারিতেছে না। "যে মাটিতে সোনা ফলে, সে মাটিতে বাংলার সমাজ-ব্যবস্থা

জড়িত এবং যে মাটিতে বাঙ্গালার অর্থ-উদ্যম বাধিত হচ্ছে, সে মাটি আজ সন্দেহের আকর হয়েছে।" আজ আর্থিক দুর্গতির দিনে, উৎসব অনুষ্ঠানের দিনে স্বভাবতঃই এই কথাই মনে আসে যে পুরাতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমানের এই অন্তর বিরোধের মূল কোথায় ?

বাঙ্গালীর উৎসব অনুষ্ঠানে সমাজের প্রত্যেকটী ব্যক্তি, বৃত্তি ও ব্যবস্থা এমনকি সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, চণ্ডাল, শূদ্র, ধনী, দরিদ্র কেহই বাদ পড়িত না। সেখানে ঘর কলাকদি ছিল না, হর্কাদ কর্ণারের ভীড় ছিল না। সহরের পথে-ঘাটে আধুনিক ভীড় বৈচিত্র্যে নিষ্পেষিত, নির্যাতিত হইতে হইত না। সেদিন বিরাম অবসরে সকলেরই শান্তি-স্নিগ্ধ মনের, সরল জীবনযাত্রার, সমাজ-ধর্ম-মনের একটা অনাবিল প্রকাশ ঘটিত। সে প্রকাশ আভিজাত্যের নহে, বিলাস-আড়ম্বরের প্রতিযোগিতা নহে, একান্তই নিজেকে সকলের সঙ্গে এক করিয়া সমগ্রতায় পরিপূর্ণ করিয়া তোলা।

আজ ইহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যুগের তালে তাল রাখিয়া মানুষ চলিয়াছে তাহার আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। তবুও তাহার কয়েকটা দিনের উৎসব-আয়োজন সার্থক হউক, দৈনন্দিন দুঃখ-দৈন্যের উর্দ্ধে মানুষ তাহার আপন সত্তা ফিরিয়া পাউক, মনুষ্যত্বের মর্যাদায় মানুষের সংবেদনশীল মন আনন্দের অনুভূতিতে সঞ্জীবিত হউক, সার্থক হউক মানুষের সকল প্রচেষ্টা, আমরা এই শুভেচ্ছা কামনা করি বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসবের পূর্বক্ষণে।

———

With season's greetings from

THE BRITANNIA ENGINERING CO. LIMITED

Mg. Agents : **McLeod & Co. Ltd**

TITAGHUR, W. BENGAL • MOKAMEH, BIHAR

বেলগ্রেড সম্মেলন

অধ্যাপক শ্রীমুকুন্দবিহারী মিত্র

গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে পৃথিবীর চব্বিশটি নিরপেক্ষ জাতির যে সম্মেলন হইয়া গেল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তাহা কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। জার্মানী, বিশেষতঃ বার্লিন, সমস্যা লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে যে বিপদজনক দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছে এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন পুনরায় আণবিক পরীক্ষা আরম্ভ করায় যে নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই ছিল বেলগ্রেড সম্মেলনের প্রধান পটভূমিকা। এই দুইটি বিষয়ের সহিত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, অত্যাচার এবং এই ধরণের অন্য কতকগুলি সমস্যা যাহা এখনও বিশ্বশান্তির পথে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া আছে তাহাও ঐ সম্মেলনে আলোচনা হইয়াছিল; কিন্তু সঙ্গত কারণেই বার্লিন ও আণবিক পরীক্ষাই বেলগ্রেডকে মুখর করিয়া রাখিয়াছিল; কারণ এই দুইটি সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এমন কি মানব জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। যদি বার্লিনকে কেন্দ্র করিয়া শক্তিমত্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র আবার পৃথিবীকে যুদ্ধের পথে টানিয়া আনে অথবা অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতাই অন্ধ হইয়া তাহারা আণবিক পরীক্ষা হইতে নিরস্ত না হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে যে অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহাতে সমস্ত মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য। বেলগ্রেডে সম্মিলিত নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রতিনিধিগণ এই ভয়ঙ্কর অবস্থার প্রতিরোধের জন্য কতদূর কি করিতে পারিয়াছেন তাহার বিচার আপাতদৃষ্ট ফলাফলের দ্বারা না করিয়া যে মানসিক আবহাওয়াকে উহা একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়াছে তাহার দ্বারা উহার মূল্য নিরূপণ করাই সমীচীন হইবে।

বেলগ্রেড সম্মেলনের সহিত ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলনের অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও এই দুইটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমতঃ বান্দুং সম্মেলন শুধু এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বেলগ্রেড সম্মেলনে সমস্ত পৃথিবী হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্র যোগ দিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বান্দুং সম্মেলনে নিরপেক্ষ ও শক্তি গোষ্ঠীর অন্তর্গত দুই শ্রেণীর রাষ্ট্রই অংশ গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু বেলগ্রেডে শুধু নিরপেক্ষ রাষ্ট্রই উপস্থিত ছিল। তৃতীয়তঃ, বান্দুং'এর আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চশীলকে ভিত্তি করিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলি কতদূর একটি ঐক্যবদ্ধ নীতি গ্রহণ করিতে পারে তাহা স্থির করা; কিন্তু বেলগ্রেড সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল বার্লিনকে লইয়া যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে এবং আণবিক পরীক্ষা পুনরায় আরম্ভ হওয়ায় যে

বিপদের উদ্ভব হইয়াছে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির পক্ষে তাহা প্রতিরোধ করা কতদূর এবং কি ভাবে সম্ভব তাহা আলোচনা করা। সুতরাং বান্দুং ও বেলগ্রেডের মধ্যে প্রকৃত দায়ত্ব বিস্তর। এই দুই সম্মেলনের মধ্যে একমাত্র মিল এই যে দুই শক্তিগোষ্ঠীর দুই নায়ক রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়ের কোনটিতেই উপস্থিত ছিলনা—যদিও এই অনুপস্থিতির কারণ এক নহে।

বিশ্ব-পরিস্থিতি যেভাবে দ্রুত অবনতির দিকে যাইতেছে তাহাতে নিরপেক্ষ সম্মেলনের কোনও সার্থকতা আছে কি না। এমন কি এইরূপ একটী সম্মেলন এই অবস্থায় আহ্বান করা সঙ্গত হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে কোন কোন রাষ্ট্রের সন্দেহ ছিল। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর মনে এইরূপ সন্দেহ বিশেষভাবে জাগিয়াছিল। সেইজন্য যখন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের ও যুগোস্লোভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো (এই তিন জনেই বেলগ্রেড সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন) নিরপেক্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব করেন, তখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী বিশেষ উৎসাহ দেখান নাই; বরং ইহার কি কুফল হইতে পারে সেই সম্বন্ধে তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। বেলগ্রেডের পূর্বে কাইরোতে যে প্রস্তুতি সম্মেলন হইয়াছিল সেখানে এই কারণেই ভারত হইতে অনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিনিধি পাঠান হয় নাই। বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী কেবলমাত্র আলোচনার গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যদিও ইহাতে সন্দেহ দূর হইবার মত কোনও কারণ ঘটে নাই তবুও শেষ পর্যন্ত ভারত নিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়াই স্থির করে এবং একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে প্রধানতঃ শ্রীজওহরলাল নেহেরুর ব্যক্তিত্বে ও চেষ্টায় বেলগ্রেডে কোন কোন রাষ্ট্র যে নিরপেক্ষ গোষ্ঠী সৃষ্টি করিবার উৎসাহ এবং স্থানীয় সমস্যা উত্থাপনের আগ্রহ দেখান তাহা সংযত করিয়া প্রধান দুইটী বিশ্ব সমস্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা সম্ভব হইয়াছিল।

ইহা অবশ্য অনস্বীকার্য যে বাস্তব বিষয়ে রাজনীতির বিশেষতঃ আধুনিক কালের বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর রাজনীতিতে, উপরোধ, অনুরোধ বা নীতিবাক্যের কোনও স্থান নাই এবং বর্তমান পারস্পরিক সন্দেহের আবহাওয়াতে তাহা থাকাও সম্ভব নহে। রাশিয়া বা আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কেরা এত নির্বোধ নহে যে এই ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের যুগে আর একটি যুদ্ধের ভীষণ ফলাফল বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিত্তিতে ক্রমাগত আণবিক পরীক্ষার বিষময় পরিণাম কি হইবে তাহা তাহারা বোঝে না। সেই পরিণাম হইতে যে তাহাদের নিজেদের দেশের নিষ্কৃতি নাই, সে সম্বন্ধেও তাহারা নিশ্চয়ই অচেতন নহে। তবুও এই সর্বনাশা পথ হইতে ইচ্ছা করিলেই আজ তাহারা হঠাৎ সরিয়া আসিতে পারেনা, তাহার কারণ, একে অপরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভয় ও সন্দেহ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নিরপেক্ষ দেশগুলির নৈতিক চাপে অথবা সম্মিলিত অনুরোধে এই ভয় ও সন্দেহ হইতে তাহারা যে মুক্ত হইবে ইহা আশা করা অযৌক্তিক। প্রকৃতপক্ষে যদি কাহারও মনে এইরূপ আশার উদ্রেক হইয়া

থাকে তবে বেলগ্রেড সম্মেলনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে রাশিয়া কর্তৃক আণবিক পরীক্ষার পুনরারম্ভ সেই আশাকে নিশ্চয়ই ধূলিসাৎ করিয়াছে। রাশিয়ার পরেই আমেরিকার আবার আণবিক পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় প্রবেশ যেন এই মনোভাবেরই ইঙ্গিত করিতেছে যে যাহারা শক্তির অধিকারী তাহারা শক্তিহীনের মিলিত আবেদন উপেক্ষা করিয়াও শক্তির দ্বারাই নিজেদের বিবাদের মীমাংসা করিবে। সুতরাং বেলগ্রেড হইতে দুর্বল নিরপেক্ষদের যে শক্তির আবেদন মস্কো ও ওয়াশিংটনে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহা সন্দেহ ও আতঙ্কগ্রস্ত এই দুই শক্তিগোষ্ঠীর নায়কদের স্ব স্ব নীতি হইতে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহা মনে করা ভুল হইবে।

বেলগ্রেডে আলোচনার দ্বারা আগাগোড়া ঠিক অভীপ্সিত পথে চলে নাই। শ্রীজহরলাল নেহেরু যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন অন্ততঃ প্রথম পর্যায়ে ইহার গতি সেই দিকে কিছুটা চলিয়াছিল। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধীন সমস্যাকে সম্মেলনের সম্মুখে জরুরী আকারে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করেন; আবার অন্য কেহ কেহ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রদের লইয়া একটা পৃথক গোষ্ঠী সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন; অন্য কাহারও বক্তৃতায় বার্লিন সমস্যার ব্যাপারে কোন্ পক্ষ ন্যায় ও কোন্ পক্ষ অন্যায় পন্থা অনুসরণ করিতেছে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পরিস্ফুট হইয়া উঠে; কেহ কেহ আবার তাহাদের মতানুসারে ঐ সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান কি ভাবে হইতে পারে তাহাও ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস করেন; কোনও কোনও বক্তা প্রথমদিকে রাশিয়া কর্তৃক আণবিক পরীক্ষার পুনরারম্ভের উল্লেখ পর্যন্ত করেন না। এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী যদি শেষ পর্যন্ত আলোচনার ধারাকে প্রভাবান্বিত রাখিত তবে বেলগ্রেডের আসল উদ্দেশ্য অন্তর্হিত হইয়া নিরপেক্ষ রাষ্ট্রদের নিজেদের মধ্যেই মতভেদ তীব্রতর হইয়া উঠিত এবং তাহারা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যাইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, প্রধানতঃ শ্রীনেহেরুর চেষ্টায়, এই পরিস্থিতিকে এড়াইয়া সম্মেলন শেষ অবধি প্রধান সমস্যাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মতৈক্যে পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছিল। বার্লিন ও আণবিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া রাশিয়া ও আমেরিকার পরস্পর আলোচনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া সম্মেলনের মূল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই কি ভাবে এই দুইটি প্রধান সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহার কোনও ইঙ্গিত না দিয়া শুধু দুইপক্ষের আলাপ আলোচনার প্রয়োজনীয়তার উপরই সিদ্ধান্তকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। সম্মেলনে ইহাও স্থির হয় যে বেলগ্রেড হইতেই সরাসরি এই সিদ্ধান্তকে মস্কোয় লইয়া যাইবে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও ঘানার রাষ্ট্রপতি এবং ওয়াশিংটনে লইয়া যাইবে ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী ও মালীর রাষ্ট্রপতি। সেই অনুসারে নিরপেক্ষ সম্মেলনের এই প্রতিনিধিগণ রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী খ্রুশ্চেভ ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং উভয়ের নিকট হইতে যে মনোভাব ব্যক্ত হয় তাহাতে আলাপ আলোচনার দ্বারা সমস্যার মীমাংসা করিয়া শান্তি স্থাপনের আগ্রহের অভাব না থাকিলেও উহার জন্য নিজ নিজ নীতি হইতে বিচ্যুত হইবার আভাস পাওয়া যায়না।

এই দিক হইতে দেখিলে বেলগ্রেড সম্মেলনের কোন প্রত্যক্ষ ফল হইয়াছে তাহা বলা যায় না। তবে অন্য আর একদিক হইতে বিচার করিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে এই সম্মেলন যতটুকু এবং যে আকারে ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা গিয়াছিল তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। দুই শক্তিগোষ্ঠী এখন ভয়, সন্দেহ এবং বিদ্বেষের তাড়নায় পরস্পর হইতে এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার দ্বারা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা মনে মনে অনুভব করিলেও কার্যতঃ তাহা করিবার পথ খুঁজিয়া পাওয়া তাহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় প্রথম প্রয়োজন তাদের মধ্যে সেই পথ সৃষ্টি করা। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলন সেই পথ সৃষ্টির প্রকৃত সহায়তা করিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে যোগাযোগের জন্য এইসম্মেলনকে সেতুরূপে উপস্থিত করিয়াছে। অতএব ইহার কার্যকারিতা অস্বীকার করা যায় না। বার্লিন এবং আণবিক পরীক্ষা লইয়া ঘটনার স্রোত যেদিক চলিয়াছিল বেলগ্রেড সম্মেলনের পর হইতে, সাধারণভাবে অনুভূত না হইলেও, তাহা যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্ততঃপক্ষে, যুদ্ধের পরিবর্তে আলোচনার জন্য যে উভয় পক্ষই প্রস্তুত হইতেছে, সে সম্বন্ধে এখন বিশেষ সন্দেহ নাই। অবশ্য, ইহা বেলগ্রেডের প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইবেনা; তবে পরোক্ষভাবে যে তাহারও কোন প্রভাব এই আবহাওয়া সৃষ্টির সহায়তা করে নাই তাহাও ধারণা করা সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত নহে।

With the best Compliments of

Messrs. KALINGA TUBES LIMITED.

33, Chittaranjan Avenue, Calcutta-12

Factory : **Choudwar, Cuttack, Orissa.**

MANUFACTURERS OF STEEL TUBES *for*
WATER AND GAS DISTRIBUTION

ভারতে পরিকল্পনা রচনার নীতি

শ্রীপি, এস, লোকনাথন

ভারত কিরূপ নীতি অনুসারে তাহার উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করিবে সে বিষয়ে গত কয়েক বৎসরে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নের যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে সে বিষয়ে দেশের সকলে একমত হইয়াছেন। তাহা হইলেও কেহ কেহ ইহা বিশ্বাস করেন যে, উন্নয়নে যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা গণতন্ত্রের প্রসারে বিরোধী এবং তাহা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে প্রতিকূল বলিয়া দেশের বর্তমান অধিবাসীদিগকে তাহার অত্যধিক গুরুভার বহন করিতে হইবে।

পরিকল্পনা রচনা নীতি বলিতে বুঝাইবে ভবিষ্যৎ ফল লাভের উদ্দেশ্যে কি উপায় অবলম্বন করা হইবে এবং কোন কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় উন্নয়ন নীতির কোন সুস্পষ্ট সূত্র নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই নীতি রূপায়নের এবং দীর্ঘ মেয়াদী আর্থিক উন্নয়নের সহিত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই নীতি সুস্পষ্টভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে।

আমাদের উন্নয়নের নীতি কিরূপ হইবে তাহা আমাদের লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে। এই লক্ষ্য হইল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন। সংবিধানে যে সকল সামাজিক লক্ষ্য সাধনের কথা বলা হইয়াছে সেই সকল এই সমাজে সাধিত হইবে।

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজ্য তাহার নীতি পরিচালিত করিবে—(১) ক্ষেত্র-কর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত লাভের অধিকার থাকিবে, (২) সাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাস্তব সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে। (৩) আর্থিক ব্যবস্থা পরিচালনা অর্থে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করা নয় এবং উৎপাদনের উপায় অর্থে সাধারণের ক্ষতি নয়। গণতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর মধ্যে এই সকল উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে।

দীর্ঘ মেয়াদের পরিপ্রেক্ষিতে নীতি নির্ধারণ

আমাদের উন্নয়ন নীতি ৫ বৎসরের একটি পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে নয়, ২৫/৩০ বৎসরের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করা হইতেছে। প্রত্যেকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এক একটি স্বতন্ত্র ইউনিট নয়, উহা সমগ্র উন্নয়ন সূচীর অংশ বিশেষ। প্রত্যেক পরিকল্পনাকালের লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারের একটা যোগসূত্র থাকে।

(৫০৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রীরাখালচন্দ্র দত্ত
অর্থনীতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচ্য নিবন্ধের উদ্দেশ্য উন্নয়নমূলক অথবা অনুন্নত অর্থনীতিতে পরিকল্পিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষি অথবা প্রাথমিক অর্থনীতির কোন অবদান আছে কিনা তা বিশ্লেষণ করা এবং সমসাময়িক অর্থনৈতিক প্রস্তাবনীতে সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সাধারণ নীতি বর্ণিত হইয়াছে কিনা তাহা অনুশীলন করা।

মনে হয়, বিবিধ উৎপাদন ক্ষেত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে দেশে-বিদেশে এপর্যন্ত যে সব পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সূত্র পর্যালোচনা করিলে এ-সম্পর্কে একটা মোটামুটি ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

মার্কেনটাইলিজম্ অথবা বণিকবাদ একসময়ে বাণিজ্য-বিস্তারের বিশেষতঃ বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তারের অনুকূলে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ঐ নীতির গোড়ার কথা ছিল আমদানী অপেক্ষা রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা অনুকূল বাণিজ্য তথা উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা। এই নীতির সমর্থকদের রচিত পুস্তক হইতে দেখা যায় যে তাহারা জাতীয় মূলধন বৃদ্ধির প্রয়োজনে কখনও কৃষিকে গুরুত্ব দেন নাই এবং জাতীয় শক্তি ও সংহতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাহার উল্লেখও করেন নাই। অবশ্য এই নীতির সত্যতা অবিসংবাদিতভাবে গৃহীত হয় নাই তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়।

ফরাসী অর্থনীতিবেত্তারা— ফিজিওক্র্যাট্ নামে অভিহিত—অবশ্য আর্থিক কাঠামোর যে চিত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাতে জাতীয় ক্ষেত্রে নীট্ উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্য কৃষি-উৎপাদনকে গুরুত্ব দিয়াছিলেন। ইহার অর্থ হইল, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত কৃষি উৎপাদনকেও যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া। অবশ্য আজ ইহা সর্বজনবিদিত যে, উৎপাদন ক্ষেত্রে এইসব অর্থনীতিবিদের চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ ছিল এবং কৃষি সম্পর্কে তাহাদের ধারনাও অতিরঞ্জিত ধারণাও ছিল। তাহার কারণ, তাহাদের সমসাময়িক কালে কৃষিই মুখ্য উৎপাদন ক্ষেত্র ছিল এবং সে সময়ে শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন তেমন প্রসার লাভ করে নাই। সে দিন এতৎসত্ত্বেও কৃষি অবহেলিত অর্থনৈতিক বিষয় ছিল এবং সেই জন্যই ফিজিওক্র্যাট্রা ফরাসীদেশে কৃষির উন্নতির জন্য পুনঃপুনঃ মূলধন নিয়োগ দ্বারা ইহাকে যুগোপযোগী করিবার জন্য দাবী জানাইয়াছিল। এই দিক দিয়া বিচার করিলে ফিজিওক্র্যাট্দের যুক্তি জ্ঞানসম্মত—যদিও নীতিগতভাবে এই গুরুত্ব দানে যথার্থ কোন ফল হয় নাই।

ইহার পরবর্তীকালে অ্যাডাম স্মিথ এবং ডেভিড রিকার্ডো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবসম্পন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অ্যাডাম স্মিথ ফিজিও-

ফ্র্যাঙ্কলিনের এই যুক্তিকে বহু সংস্কার বলিয়া হাস্যস্পদ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিও অবশ্য উত্তরকালে ফিজিওক্র্যাটদের মতই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষির উচ্চস্থান স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন কৃষিক্ষেত্রে কাজে লাগাইলে সেই অনুপাতে কৃষিক্ষেত্রে অধিকতর পরিমাণে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে যে আয় বৃদ্ধি হয়, তাহা শুধু নিযুক্ত শ্রমিকদেরই আয় বৃদ্ধি করে না, কৃষি-মালিক এবং জমিদারদেরও আয় বৃদ্ধির সহায়ক হয়। ডেভিড রিকার্ডো, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে চিন্তাধারার পরিপোষক ছিলেন, তাহাতে খাদ্য উৎপাদনকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উৎস বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের প্রধান অন্তরায় হইল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জমির অভাব এবং তাহার ফলে Law of Diminishing Returns এর প্রতিক্রিয়া।

কৃষির ভূমিকা সম্পর্কে ফিজিওক্র্যাট এবং ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌দের এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অসাধারণ কিছুই নাই। কারণ তদানীন্তনকালে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেই জাতীয় শ্রমের অধিকাংশ নিয়োজিত থাকিত। সেইজন্যই তাঁহাদের চিন্তাধারার ক্ষেত্রে কৃষি উপেক্ষিত হইতে পারে নাই। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রভাব হ্রাস পাইয়াছে। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন একটি বিষয়কে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাহার ফলে অর্থনৈতিক চিন্তাধার ক্ষেত্রে একটী সহজ, সরল ও সাধারণ নীতি গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। একদিক দিয়া ইহা বাঞ্ছনীয় হইলেও উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বিষয় যথাযথ গুরুত্ব লাভ না করিয়া প্রভাবশীল-ক্ষেত্রটিই গুরুত্ব লাভ করে।

বর্তমানকালে উৎপাদনের ক্ষেত্রে আনুপাতিক গুরুত্ব আরোপের কথা বলা হইয়াছে। এই ব্যাপারে কলিন ক্লার্ক ও সমসাময়িক অর্থনীতিবিদদের আলোচনা যথেষ্ট আলোকপাত করে। ইহাদের আলোচনা হইতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা এই যে, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও জনকল্যাণের প্রশ্নে বিভিন্ন দেশে বৃত্তিমূলক কাঠামোর তারতম্য অনুপাতে ঘটিয়া থাকে। কলিন ক্লার্কের মতে প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষেত্রে আনুপাতিক লোক নিয়োগ এবং গৌণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই হারের আধিক্য জনকল্যাণের নিম্নমানের জন্য দায়ী। উন্নতি-শীল দেশসমূহে দেখা যায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে লোক নিয়োগ সাধারণতঃ প্রাথমিক হইতে গৌণ এবং পরে গৌণ হইতে অন্যান্য ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হইতে থাকে। তবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছিলে কৃষির গুরুত্বও হ্রাস পায়। কারণ কৃষিজাত দ্রব্য বিশেষতঃ খাদ্যের চাহিদা আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে। এ প্রসঙ্গে সাধারণতঃ এঙ্গেল ও কেইনসের ভোগ-নীতির নজীর দেখানো হয়।

নীতিগতভাবে কলিন ক্লার্কের এই মতের অনুগামী হইলেও দেখা যায় যে তাঁহার নীতি এঙ্গেল-উত্তর অর্থনৈতিক যুগে যে সব দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ করিয়াছে তথায় প্রযোজ্য। কারণ, সে যুগে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণতা ছিল। কিন্তু আধুনিক-

কালে অনুন্নত অর্থনৈতিক দেশসমূহে খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারের সহিত সম্প্রসারিত কৃষিক্ষেত্রের অগ্রগতির আনুপাতিক হারও বিচার করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, উন্নত অর্থনৈতিক দেশসমূহেও কৃষি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও এই কথা বিচার্য। দ্বিতীয়তঃ অনুন্নত দেশে বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নমূলক অর্থনীতিতে কৃষির অগ্রাধিকার বিশেষ ভাবে বিচার্য—এবং তাহা রাষ্ট্রের পক্ষপাতী পুষ্ট ভারসাম্য উন্নয়ন হউক বা না হউক। এই বিতর্কের উপর অনেক প্রবন্ধ রচনা করা যাইতে পারে। আমরা ধরিয়া লইয়াছি অর্থনীতির বিভিন্ন শাখা একই সঙ্গে উন্নয়নের পথে চলিতে থাকিলে কোন শাখার অতিরিক্ত চাহিদা আর একটি শাখা অতিরিক্ত সরবরাহের দ্বারা মিটানো সম্ভব হইবে। সুতরাং দীর্ঘ মেয়াদী কালের ভিত্তিতে বিভিন্ন শাখার উন্নয়নের মধ্যে কোন পার্থক্য বা ব্যবধান থাকিবে না। কিন্তু স্বল্প মেয়াদীকালে সম্পদ সংগ্রহের প্রয়োজনে বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হইতে পারে। অতএব এই সব সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের বণ্টন সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই যথাযথ নীতি নির্ধারণ করা উচিত।

প্রথমে বিচার করিতে হইবে যে, শিল্প-উন্নয়নের প্রয়োজনে কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। অনুন্নত অর্থনীতি সম্পন্ন দেশগুলিতে প্রথমতঃ গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকের আধিক্য দেখা যায়। এই সব শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতার হার অত্যন্ত নিম্ন কখনও বা শূন্য। কৃষি উন্নয়নের প্রয়োজনে সাধারণতঃ যে পদ্ধতি গৃহীত হয়, তাহাতে শ্রম লাঘব নীতি অথবা কম শ্রমিক নিয়োগ পদ্ধতি অনুসৃত হয়। সহরাঞ্চলে সেইজন্য বেকার অথবা প্রচ্ছন্ন বেকারদের কাজে লাগাইবার জন্য শিল্পায়নের প্রয়োজন অনুভব করা হয়। কখনও আবার এমনও দেখা যায় যে কৃষিক্ষেত্রে হইতে পর্যাপ্ত সংখ্যক লোককে অন্যান্য ক্ষেত্রে টানিয়া না আনিতে পারিলে কৃষির উন্নতি সম্ভব হয় না। এই উদ্দেশ্যে শিল্পের উন্নয়ন প্রথমে প্রয়োজন হয়। তাহা ছাড়া শিল্পক্ষেত্র এ ব্যাপারে অধিকতর সক্রিয়। শিল্প মালিকেরা ঝুঁকি লইতে আগ্রহী, নূতন পদ্ধতি গ্রহণে উৎসুক এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে উদ্যমশীল। শিল্পক্ষেত্রে উপরোক্ত অর্থ উপার্জন বা আয় সৃষ্টি অধিকতর সহজ বলিয়া সঞ্চয়ের হারও বেশী।

আলোচ্য পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পোন্নয়নকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার কারণ কৃষির বেলায় কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্য আন্তর্জাতিক মূল্যস্তরের সঙ্গে সঙ্গে উঠা-নামা করে। আর সেইজন্যই জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে কোন দেশেরই আর্থিক কাঠামো কৃষি-কার্যের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠা উচিত নহে। সর্বশেষে ইহা বলা যাইতে পারে যে শিল্পোন্নয়ন দ্বারা অর্থনৈতিক কাঠামোর বাহ্যিক সম্প্রসারণও সম্ভব।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছিলাম, কৃষির গুরুত্বের কথা। তাহার কারণ এই যে, স্বল্প মূলধনে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে কৃষির উন্নতির দ্বারাই তাহা সম্ভব। অনুন্নত

দেশগুলিতে মূলধনের অভাবই প্রধান অন্তরায় এবং অল্প মূলধনের দ্বারা অধিক উৎপাদন একমাত্র কৃষিক্ষেত্রেই সম্ভব বলিয়া কৃষিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অধিকন্তু ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন অর্থনৈতিক প্রয়োজনে বাঞ্ছনীয় হইলেও অনুন্নত দেশে শিল্পোদ্যোক্তার অভাব, সংস্থাগত ত্রুটি এবং সামাজিক গঠন ভঙ্গীর ত্রুটি হেতু দ্রুত শিল্পোন্নয়ন অনেক সময় সম্ভব হয় না। সেই জন্য অল্প স্বল্প পরিবর্তন করিয়া কৃষি উন্নয়নকে প্রারম্ভিক ক্ষেত্র হিসাবে বাছিয়া লওয়া উচিত। কারণ কৃষি উন্নয়নের প্রয়োজনে ব্যয়-বাহুল্য নিতান্ত কম। (যেমন গৃহ নির্মাণ, সমাজ সেবা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি-ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ তেমন বেশী হয় না)। অথচ ইহার জন্য লোকসংখ্যার স্থানান্তরও দ্রুত প্রয়োজন হয় না। কৃষি উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার তেমন প্রয়োজন হয় না। বরং কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানির দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়। অন্ততঃ খাদ্য ও কাঁচামাল আমদানীর জন্য পরনির্ভরতা অনেকখানি হ্রাস পায়।

অন্যদিকে এই যুক্তি দেখানো হয় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম প্রকাশ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে। এই বর্ধিত আয় সাধারণতঃ খাদ্য ও বস্ত্রে ব্যয়িত হয়। অতএব হয় এই সব দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াইতে হইবে অথবা আমদানী করিতে হইবে। আরও বলা হয় যে, কারখানাজাত শিল্প প্রথম পর্যায়ে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষম হয় না এবং সেই হেতু আভ্যন্তরীণ বাজারের উপর নির্ভর করিয়া সেগুলি গড়িয়া উঠে। এই অভ্যন্তরীণ বাজার অবশ্যই বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চল। অতএব যাহাদের উপর নির্ভর করিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়, যদি সেই অঞ্চলই অনুন্নত থাকে, তবে উন্নয়নের অর্থ অধিকাংশেই অপচয়ের সামিল হয়।

উপরের আলোচনা হইতে সত্যের সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, রাষ্ট্র প্রণোদিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির প্রকৃত স্থান কোথায়? ইহার সমাধান খুবই সহজ, কারণ এই জটিল সমস্যার অব্যবহিত পরে বলিয়া কিছুই নাই। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে কাহার অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত, তাহা দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী অনেকগুলি চক্রাবর্ত প্রশ্নোত্তরের বিচার সাপেক্ষ। এবিষয়ে উভয়ক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতা ও কর্মসূচীর রূপায়নের সম্ভাব্যতার উপর নির্ভরশীল এবং এক দেশের পক্ষে যাহা প্রযোজ্য, অন্য দেশের পক্ষে তাহা প্রযোজ্য নাও হইতে পারে।

এই সুদীর্ঘ আলোচনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষির স্থান সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা হইয়াছে। আলোচনার পরিণতিও মনে হয় নেতিবাচক। তবে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে সমস্যার জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে-বিদেশে সমাধানের পন্থা নির্ধারণ করিতে হইবে।

——:::০:::——

ভারতে তৃতীয় পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী

সমীক্ষক

পর পর দুইটি পরিকল্পনা নীতিগতভাবে শেষ করিবার পর ভারত তৃতীয় পরিকল্পনার প্রশস্ত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল। পরিকল্পনা অবশ্যই অর্থনৈতিক যদিও রাজনৈতিক চিন্তাধারা হইতে বিচ্যুত নহে। বরং একটু বাঁকা পথে হাটিয়া বলা যায়, বর্তমান যুগে রাজনৈতিক কারণ সমূহই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পটভূমিকা রচনা করিতে প্রণোদিত করে।

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস দীর্ঘ নহে। যদিও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যেমন দীর্ঘ, তেমনি করুণ ও মর্মস্পর্শী। স্বাধীনতা লাভের পটভূমিকায় ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে অনুরূপ প্রেরণা লাভ করিবে, যে দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহের বন্যায় উদ্বেল হইয়া উঠিবে, ইহাও আশা করা স্বতঃসিদ্ধ।

এই আশা ও প্রেরণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ সালে স্বাধীন ভারতের সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৯৫১ সালে ভারতে প্রথম পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়। পাঁচ বৎসর পরে ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সূত্রপাত হয় এবং যথারীতি দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমাপ্তির পর ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে তৃতীয় পরিকল্পনা সাড়ম্বরে যাত্রা শুরু করে। পর পর দুইটি পরিকল্পনার সমাপ্তি স্বভাবতঃই দেশবাসীর মনে যে নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনা একদিকে যেমন অর্থনৈতিক অগ্রগতি নির্দেশ করে, তেমনি জাতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেশবাসীর স্বাচ্ছন্দ্য পরিকল্পনার সার্থকতার ইঙ্গিত দেয়। অবশ্য অনেকে বলিবেন, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে, সামগ্রিক সমৃদ্ধিতে স্বার্থত্যাগ ব্যতীত কখনই সমৃদ্ধির মহাজিজ্ঞাসার ও উদাত্ত উত্তর মিলিবে না!

সদ্যপ্রসূত তৃতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যে ইহা তোতাপাখীর অর্থনীতি পাঠেই সীমাবদ্ধ। উদ্দেশ্য ও বিষেব-এর মধ্যে পার্থক্য কি? বাল্যকালে ব্যাকরণের বই-এ পড়িয়াছি। সুতরাং বিধিবদ্ধ উদ্দেশ্য যদি জনকল্যাণে দাফতরের পত্রশাখায় পল্লবিত ও মঞ্জরিত হইয়া না উঠে, তবে পরিকল্পনার সার্থকতা যাচাই করা হইবে কিসে? গত দশ বৎসরের কয়েকটি ঘটনা ও তথ্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বুভুক্ষু মানুষের বহু প্রশ্নই আজও নিরুত্তর অথবা নীরব উত্তরে থামিয়া যায়। তবে প্রথমে যাহা বলিয়াছিলাম, স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগের মহামূল্য কে দিবে? পরন্তু উপর-ভারী অর্থনৈতিক কাঠামো যদি কাঁচা বনিয়াদের দরুণ হেলিয়া পড়ে, অথবা ফাটিয়া যায়, তবে তাহার জন্য দায়ী কে? যদি জনসাধারণের গভীর বিশ্বাস, একাগ্রতা ও কর্তব্য নিষ্ঠা প্রবঞ্চিত হয়, জীবনযাত্রার প্রতিপদে অন্তরায় সৃষ্টি করে, যদি তাহার ফলে সামাজিক অশান্তি, অর্থনৈতিক দুর্গতি ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে, তবে-তাহারই বা সদুত্তর কে দিবে? যদি প্রথম পরিকল্পনাকালে

জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস দেখা দিয়া থাকে, তবে তৃতীয় পরিকল্পনায় তাহাদের মুখ ভার হইবে কেন ?

এই প্রশ্নগুলি আজ সকলের মনে অল্প বিস্তর উঁকি দিতেছে। আজ সকলেই কেন দৈনন্দিন জীবনে অস্বাভাবিক গতি-প্রকৃতির জ্বালা অনুভব করিতেছে ? এই প্রশ্নটির উত্তরও সকলেই জানিতে চায়।

তৃতীয় পরিকল্পনা আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতেই দেশবাসীর স্বতস্ফূর্ত উৎসাহ যেন হ্রাস পাইয়াছে। তাহার কারণ মূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা, ভোগ্য পণ্যের অনটন, করভার এবং সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, যোগ্য ও গুণীজনের সম্মানের হানি ও সামাজিক মূল্যবোধের হ্রাস সামগ্রিক জীবনকে কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছে ; অথচ অগ্রগতি যদি উৎপাদন বৃদ্ধায়, সমৃদ্ধি যদি জাতীয় আয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়, শিক্ষা যদি ছাত্রসংখ্যা ও স্কুল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধিতে পরিমাপ করা হয়, শৃঙ্খলাবোধ যদি স্বাধীনতাহীন বৈদেশিক প্রভাব সম্পন্ন আচরণে পর্যবসিত হয়, তবে ভারতের আদর্শগত ঐতিহ্যের সমন্বয়সম্পন্ন শ্রীবৃদ্ধির পরিচয় কোথায় ? তৃতীয় পরিকল্পনার বৃহত্তর পরিসরে আজ এই সব সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজিতেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যগত অগ্রগতির পরিমাপ করিতে গেলে পাওয়া কৃষি উৎপাদন দ্বারা কৃষিজাত দ্রব্যের স্বাচ্ছন্দ্য—তা খাদ্যই হউক বা কাঁচামালই হউক। শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি একদিকে যেমন কৃষি সমৃদ্ধি, অন্য দিকে তেমনি খনিজ অথবা অন্যান্য প্রাকৃতির সম্পদের আহরণের উপর নির্ভরশীল। এগুলির সদ্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত জনবল ও অর্থবল। সাধারণতঃ যে সব দেশের অর্থনীতি স্বয়ংক্রিয় নহে, অথচ লোকসংখ্যার চাপ বেশী, সেই সব দেশের অর্থনীতি গড়িয়া তোলা হয় কৃষি-সমৃদ্ধির দ্বারা। কৃষি-সমৃদ্ধি একদিকে যেমন খাদ্যশস্যের স্বাচ্ছল্য আনে, অন্যদিকে তেমনি কাঁচা মালের প্রাচুর্য সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে কৃষিকে অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র হইতে মাঝারি, মাঝারি হইতে বৃহদায়তন শিল্প গড়িয়া তোলা হয়। তাহাতে একদিকে যেমন জনবল ধীরে ধীরে কৃষি ক্ষেত্র হইতে শিল্পক্ষেত্রে প্রকৃত স্থান আহরণ করিয়া শিল্প গঠনে সাহায্য করে, অন্যদিকে তেমনি বৃহৎ জনসমষ্টি কৃষিক্ষেত্রকে অবলম্বন করিয়া কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উৎপাদন ও ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য ভোগ করিতে থাকে। তখন হঠাৎ একটা কৃত্রিম জীবনযানের তাড়নায় মুদ্রাস্ফীতির কবলগ্রস্ত হইতে হয় না। ইতিমধ্যে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা গড়িয়া উঠে এবং কৃষি ধীরে ধীরে শতাব্দীর সংস্কার আচ্ছন্ন পদ্ধতি হইতে নূতনতর পদ্ধতি গ্রহণে সমর্থ হয়। তখন কৃষি যেমন জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করিতে থাকে, জনসংখ্যাও তেমনি ক্রম-সমৃদ্ধ অর্থনীতির নূতন নূতন ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পায়তনে কর্মসংস্থান করে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প ধীরে ধীরে মাঝারি ও বৃহদায়তন শিল্পের রূপ নেয়। ক্রমবর্ধমান আয় স্থায়ীত্ব লাভ করে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক কাঠামোয়

পরিধির মধ্যে। উন্নত আয়, সমুন্নত শিক্ষাব্যবস্থা সমাজকে যেমন সুস্থ ও সবল করে, তেমনি কুশলী ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মীদল গঠনও করে। তাহা ছাড়া, উন্নত আয় স্বভাবতই জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপন্থী এবং প্রয়োজনবোধে শিক্ষাসম্পন্ন সমস্ত দেশবাসী স্বেচ্ছায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী হয়।

ভারতের প্রথম পরিকল্পনা হইতে তৃতীয় পরিকল্পনা পর্যন্ত আলোচনা করিলে পরিকল্পনার গঠনভঙ্গীর ও দৃষ্টিভঙ্গীর এইসব ত্রুটি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। ফল হইয়াছে, বৃহৎ নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা গড়িয়া উঠিয়াছে দেশের নানাস্থানে অথচ খালের জল মিলে নাই চাষের জমিতে, বিদ্যুতের অভাব পড়িয়াছে শিল্পের প্রয়োজনে। ভারতের ঐতিহ্য যাহা ছিল তাহাতে, "যে সময়ে আমাদের দেশে পূর্তকর্ম ধর্মের অঙ্গ ছিল, তখন গ্রামে জলাশয়ের আয়োজন স্বতই ছিল বিস্তৃত, সর্বজনে মিলে আপনিই আপনার তৃষ্ণার জল জুগিয়েছে, রাজপরিষদের কোন ব্যস্তকুণ্ঠ আমলা সেবেস্তায় জলের জন্যে মাথা খুঁড়তে হয়নি।"

তেমনি বড় বড় শিল্পকারখানা স্থাপিত হইয়াছে বৃহৎ উদ্দেশ্যে—বৃহৎ যন্ত্রপাতি, আধুনিক বিলাস উপকরণ অথবা সভ্যতার স্বপ্নের উপচার নির্মাণে—মানুষের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া। পরিকল্পনাকে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা হইয়াছে উপরতলা হইতে। বাড়ীর চতুর্দিকে বাতি না লাগাইয়া আকাশ বাতি দিয়া আলোর ছটা কতদূর যায় তাহা দেখাইবার প্রয়াস হইয়াছে; অথচ নীচে মাটির পৃথিবী অন্ধকারই রহিয়া গেল। এমনি করিয়া পরিকল্পনা হয় না, দেশ-গঠন হয় না, দেশবাসী সুখী ও সমৃদ্ধ হইতে পারে না। একটি ছোট্ট কথায় ইহার নমুনা দিতেছি। দেশবাসীর সাধারণের সুবিধার জন্য আজকাল ছোট মোটর গাড়ী প্রস্তুতের আয়োজন চলিতেছে। প্রসঙ্গটি উল্লেখ করিয়া বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা বলিয়াছেন, "Even a bicycle is not a people's conveyance in India. It is still an investment far beyond the means of the masses, therefore, the car which would sell at Rs. 6,150 can hardly be called a peoples car since it would be far beyond the reach of any but a tiny section of India's upper middle class."

কর্তৃপক্ষরা ইহাকে ব্যঙ্গোক্তি বলিবেন। কিন্তু আমার মনে হয় ইহাই পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত বাণীর সার্থক প্রকাশ। ভারতের পরিকল্পনার এমনি ত্রুটি প্রতিনিয়তই নানাস্থানে আলোচিত হয়। মনে হয়, দেশের মাটির প্রতি, মানুষের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা থাকিলে পরিকল্পনা সার্থক করিতে এত সংগ্রাম করিতে হইত না।

নিম-এর তুলনা নেই

এ কথা সর্বজনবিদিত যে আয়ুর্বেদের প্রথম যুগ থেকেই ঔষধ হিসেবে নিমের ব্যবহার প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। নিমের দ্রব্যগুণ অত্যাশ্চর্য; নিমের পাতা, ফুল, বীজ, তেল, ডাল ও ছাল প্রতিটি অংশের হিতকারী গুণাবলী মহামতি চরক ও সুশ্রুত তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। নিমের পচন-নিবারক, বিষাপহারক, সঙ্কোচ-সাধক ও দুর্গন্ধ-নাশক গুণাবলীর সঙ্গে আধুনিক দন্তবিজ্ঞানের যাবতীয় উপকারী ঔষধাদির সমন্বয়ের ফলেই 'নিম টুথ পেষ্ট' আজ দন্ত-মঞ্জন হিসেবে অদ্বিতীয়।

এই সব বিবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্য 'নিম টুথ পেষ্ট'-এর সঙ্গে অন্য কোন টুথ পেষ্টের তুলনাই চলে না।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯

মাতৃপূজায় ও নিত্য-প্রয়োজনে

বঙ্গলক্ষ্মীর

ধুতি—শাড়ী—সার্টিং

অপরিহার্য্য

ভারতের প্রাচীনতম গৌরবময় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস লিমিটেড

মিলস ঃ—শ্রীরামপুর, হুগলী

হেড অফিস—৭নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

রূপরেখায়

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনা

অচল বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিকল্পনার বিষয়বস্তু

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা

ক। পরিকল্পনার কার্যকাল, মূল লক্ষ্য, পটভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গী

খ। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিকল্পনা সমূহ

গ। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ঘ। আঞ্চলিক উন্নয়ন

ঙ। সমষ্টি উন্নয়ন

চ। শিক্ষা

ছ। কর্মসংস্থান

জ। পরিকল্পনার সাফল্য

দ্বিতীয় অধ্যায় : তৃতীয় পরিকল্পনার কাঠামো ব্যয়-বরাদ্দ ও উৎপাদন লক্ষ্য

তৃতীয় অধ্যায় : বৈদেশিক মুদ্রা, রপ্তানি, তিনটি পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা।

চতুর্থ অধ্যায় : কৃষি ও গ্রামীন অর্থনীতি—সমাজ উন্নয়ন, সমবায়, মৎস্যচাষ, পশুপালন।

পঞ্চম অধ্যায় : সেচ ও শক্তি

ষষ্ঠ অধ্যায় : গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প

সপ্তম অধ্যায় : শিল্প ও খনিজ—লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, খনিজ তৈল, জাহাজ নির্মাণ, বেসরকারী শিল্পোদ্যম, ভোগ্যপণ্য শিল্প বস্ত্রশিল্প, কাগজ শিল্প, শর্করা শিল্প।

অষ্টম অধ্যায় : অর্থ সংস্থান

নবম অধ্যায় : পরিবহন ও যোগাযোগ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

প্রথম অধ্যায়

[ক] পরিকল্পনার কার্যকাল, মূল লক্ষ্য, পটভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গী

ইংরাজী ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১লা এপ্রিল আরম্ভ হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য পাঁচটি। যথা :—

১। পরবর্তী ১০ বৎসরে জাতীয় আয় ৫ শতাংশ হিসাবে বৃদ্ধি করা।

২। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করিয়া শিল্পের জন্য কাঁচামাল উৎপাদন করা ও রপ্তানী করা।

৩। ইস্পাত, জ্বালানী ও শক্তি, মেসিন তৈয়ারী শিল্প প্রভৃতি শিল্পগুলির এরূপ সম্প্রসারণ সাধন করা, যাহাতে পরবর্তী দশ বৎসরের শিল্পোন্নয়ন আভ্যন্তরীণ সম্পদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

৪। কর্ম-সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করিয়া সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করা।

৫। আয় ও ধন-বৈষম্য হ্রাস করা।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি একসূত্রে গ্রথিত। একটি আর একটির সহিত সম্পর্ক-রহিত নয় এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কথা চিন্তা করিয়াই এগুলি রচিত হইয়াছে। তাই দেশের আর্থিক কাঠামোর ক্রমোন্নতির ধারা বজায় রাখিবার জন্য পরবর্তী পরিকল্পনাটি পূর্ববর্তী পরিকল্পনা অপেক্ষা বড় হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ব্যয় হইবে ৭৫০০ কোটি টাকা আর বে-সরকারী খাতে ব্যয় হইবে ৪০০০ কোটি টাকা। খাদ্য সমস্যার তীব্রতার দরুণ কৃষি, সেচ, সমবায় ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাই তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পাইয়াছে। মোট ব্যয়ের ১৪·১ শতাংশ এবং পরিবহন ও সংযোগ ব্যবস্থার জন্য ২০ শতাংশ ব্যয় করা হইবে।

পরিকল্পনায় ভারী ও মূল শিল্পের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এগুলির জন্য মূলধন বিনিয়োগ করিতে হইবে প্রচুর, কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে না। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, ভোগ্যপণ্য উৎপাদন, মুদ্রাস্ফীতিরোধ প্রভৃতির জন্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এক কথায় জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং আয় ও ধন-বৈষম্য হ্রাস করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনই পরিকল্পনার চরম লক্ষ্য—যদিও এ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার নিখুঁত রূপটি জন সাধারণকে বোঝান সম্ভব হয় নাই।

আয় ও ধন-বৈষম্য হ্রাস করা হইবে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক, দ্বিতীয়তঃ সামাজিক কারণে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির দ্বারা জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের যে প্রচেষ্টার কথা পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে, আয় ও ধন-বৈষম্য হ্রাস ব্যতীত তাহা সম্ভব নহে। আবার ব্যাপক গণ-সহযোগিতা ব্যতীত পরিকল্পনার যথাযথ রূপায়নও সম্ভব নহে এবং এই গণ-সহযোগিতা পাইবার একমাত্র উপায় হইল নিরন্নদের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করা। "ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত, একটুকু নুন।"

[খ] পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহ

প্রগতিশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গোড়া পত্তনই ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। তখন দেশে খাদ্য ও শিল্পোকরণের একান্ত অভাব এবং গুরুতর মুদ্রা স্ফীতির সমস্যা বর্তমান ছিল। কাজেই কৃষির সর্বাঙ্গিণ উন্নতি এবং ভবিষ্যতে দ্রুততর অগ্রগতির প্রস্তুতি হিসাবেই প্রধানতঃ এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় অর্থনীতির দ্রুততর উন্নয়ন এবং দেশের সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন শক্তি এরূপভাবে বৃদ্ধি করা, যাহার ফলে পরবর্তী কয়েকটি পরিকল্পনাকালেও দেশের উন্নয়নের গতির ক্রমবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। এই পটভূমিকায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ-গঠনই অর্থনৈতিক নীতি লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবনধারণের মান কিভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই কমিটির কাজ বর্তমান আয় ও সম্পদ বণ্টনের গতিধারা পর্যবেক্ষণ করা।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জাতীয় আয় ১৯৬০-৬১ সনের মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৪,০০০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ইহার পরিমাণ হইবে ২৫,০০০ কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ৩৩ হাজার কোটি টাকা হইতে ৩৪ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। বৎসরে ২ শতাংশ হারে লোকসংখ্যা বাড়িবে; এই ভিত্তিতে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ১৯৬০-৬১ সালের শেষে ৩১০ টাকা এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ৩৮৫ টাকা হইবে। ১৯৭১ এবং ১৯৭৬ সালে যথাক্রমে ইহার পরিমাণ হইবে ৪৫০ ও ৫৩০ টাকা।

ইহার জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ জাতীয় আয়ের ১১ শতাংশ হইতে বাড়াইয়া তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে ১৩ হইতে ১৫ শতাংশ, ১৭ হইতে ১৮ শতাংশ এবং ১৯ হইতে ২০ শতাংশ করিতে হইবে। অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনায় যেখানে বিনিয়োগের পরিমাণ ১০,৫০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে সেখানে চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনায় বিনি-

ভোগের পরিমাণ যথাক্রমে ১৭ হাজার কোটি ও ২৫ হাজার কোটী টাকা করিতে হইবে। সঞ্চয়ের পরিমাণও সেই অনুপাতে বর্তমানের ৭·৫ শতাংশ হইতে বাড়িয়া যথাক্রমে ১৯·৫ শতাংশ ও ১৫ হইতে ১৬ শতাংশ এবং ১৮ হইতে ১৯ শতাংশ করিতে হইবে। পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে ভারতের অর্থনীতি বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের উপর নির্ভর না করিয়াই সন্তোষজনক গতিতে উন্নয়নের পথে চলিতে থাকিবে।

[গ] কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা

জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়নের পক্ষে কেন্দ্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার ন্যায় রাজ্য পরিকল্পনা-গুলির গুরুত্ব খুব বেশী। কৃষি, শিক্ষা, সমাজ সেবা এবং পল্লীর লোকদের সম্ব্যবহারের যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ রাজ্য পরিকল্পনাগুলির রূপায়নের সাফল্যের উপরই নির্ভর করিবে। বৃহৎ ও মূল শিল্পের উন্নয়নের জন্য রাজ্যগুলিকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ও কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, বাসগৃহ নির্মাণ, শহর ও পল্লী উন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচীও রাজ্য সরকারসমূহকে গ্রহণ করিতে হইবে। বিভিন্ন রাজ্যের পরিকল্পনা রচনাকালে এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার দশ বৎসরে জাতির যে পরিমাণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরেই সেই পরিমাণ উন্নয়নের কার্য সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই বিরাট কর্মসূচী রূপায়িত করিতে হইলে প্রশাসনিক যোগ্যতাও বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাহা ব্যতীত তৃতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজ্য সরকারসমূহকে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে।

[ঘ] আঞ্চলিক উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধা যাহাতে দেশের সকল অঞ্চলে সকল লোকে সমানভাবে ভোগ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নের কর্মসূচী রচনা করা দরকার। এইজন্য বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন ও উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচী রচনা করিতে হইলে কেন্দ্র এবং রাজ্যসমূহের বিভিন্ন সংস্থাগুলি এবং বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সামাজিক গবেষণা সংস্থাগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশন এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। পঞ্চম পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত একটা দীর্ঘ মেয়াদী সামগ্রিক কর্মসূচী রচনার জন্য আগামী তিন বৎসরে উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। তবে ঐগুলি প্রধানতঃ রাজ্য পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। রাজ্য পরিকল্পনা রচনাকালে যতদূর সম্ভব কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সমাজ সেবা ব্যবস্থার

উন্নয়নের প্রতি যতদূর সম্ভব দামর্থ্য নিয়োগ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।
সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন রাজ্যে বিনিয়োগের আকার ও পদ্ধতি এমনভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে, যাহাতে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস পায়। তৃতীয় পরিকল্পনায় অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বেসরকারী উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুরীর সময় অনুন্নত অঞ্চলের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখা হইবে।

[ঙ] সমষ্টি উন্নয়ন

বর্তমানে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী ৩১০০টী উন্নয়নের ব্লকে সম্প্রসারিত। প্রায় ৩৭ হাজার গ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যেই দেশের সমগ্র পল্লী অঞ্চলে ঐ কর্মসূচী সম্প্রসারিত হইবে। প্রথম দুইটি পরিকল্পনায় সমষ্টি উন্নয়নের জন্য ২৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় ঐ খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে ২৯৪ কোটি টাকা। তাহা ছাড়া, পঞ্চায়েতের জন্য ২৮ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তন করার জন্য ইতিমধ্যেই অন্ধ্র, আসাম, মাদ্রাজ, মহীশূর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে আইন চালু করা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ বিধান সভায় আইন পাশ করা হইয়াছে। অন্যান্য রাজ্যেও এই আইন প্রবর্তনের জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে। দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার সুগম ও ক্রম-উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তন করা হইতেছে।

[চ] শিক্ষা

তৃতীয় পরিকল্পনায় ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরি শিক্ষাসহ শিক্ষা খাতে মোট ৪৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হইয়াছিল ১৪৩ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ ছিল ২৩৬ কোটি টাকা।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়সের সকল শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। এই সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৩ হাজার, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮১০০ এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪২০০ করা হইবে। দেশে মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৪% বাড়িয়া হইবে ৪৯৪৫০০।

উক্তসময়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ শিক্ষা-শিক্ষণ সংস্থার মোট সংখ্যা দাঁড়াইবে ১৮০০।

[ছ] কর্মসংস্থান

উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই আগামী পাঁচবৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ হইবে। পল্লী অঞ্চলে বেকার এবং আধা-বেকার পাশাপাশি রহিয়াছে। অপরদিকে শহর অঞ্চলে বেকার সমস্যার তীব্রতা শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবহন ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংযুক্ত।

বেকারের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক হিসাব না পাওয়া গেলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রায় ৯০ লক্ষের মত লোক বেকার থাকিয়া যায়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নূতন কর্ম প্রার্থীর সংখ্যা হইবে প্রায় ৯ কোটি ৭০ লক্ষের মত। ইহার এক-তৃতীয়াংশ হইবে শহর অঞ্চলের। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত এক কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হইতে হইতে পারে—ইহার মধ্যে কৃষিকার্যে ৩৫ লক্ষের এবং কৃষি ছাড়া অন্যকাজে ১ কোটি ৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কোন কোন ক্ষেত্রে কি পরিমাণ অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হইতে পারে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

১।	নির্মাণ কার্য	২৩ লক্ষ
২।	সেচ ও বিদ্যুৎ	১ লক্ষ,
৩।	রেলওয়ে	১ লক্ষ ৪০ হাজার
৪।	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৮ লক্ষ ৮০ হাজার
৫।	শিল্প ও খনি	৭ লক্ষ ৫০ ৫০ হাজার
৬।	ক্ষুদ্র শিল্প	৯ লক্ষ
৭।	বন মৎস্য চাষ প্রভৃতি	৭ লক্ষ ২০ হাজার
৮।	শিক্ষা	৫ লক্ষ ৯০ হাজার
৯।	স্বাস্থ্য	১ লক্ষ ৪০ হাজার
১০।	অন্যান্য সমাজ সেবা	৮০ হাজার
১১।	সরকারী কাজ	১ লক্ষ ৫০ হাজার
১২।	শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি	৩৭ লক্ষ ৮০ হাজার

কাজেই দেখা যাইতেছে যে আরও ৩০ লক্ষ লোকের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

[জ] পরিকল্পনার সাফল্য

কথিত আছে বারবারা উটনের "Plan or No Plan" এই প্রশ্ন শুনিয়া মিঃ এভরিবডি সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিয়াছিলেন 'Plan' : মিঃ এভরিবডি হয়তো এত না বুঝিয়া পরিকল্পনা রচনা করিতে বলিয়াছিলেন। পরিকল্পনা বলিতে একটি জটিল কর্মসূচীর প্রণয়ন বুঝায়। পরিকল্পনার রচনার পদ্ধতি তখনই পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারায়, যদি আমরা বুঝি যে, কোন রাষ্ট্র তাহার সম্ভাব্য সম্পদ ও সামর্থ্য উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া একটি সুচিন্তিত ও সুবিবেচনাপ্রসূত অর্থনৈতিক কার্যসূচী রচনা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইবে দীর্ঘ মেয়াদী কালের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যকে সফল ও সার্থক করিয়া তোলা এবং সমস্ত প্রকার জাতীয় সম্পদকে জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত করা। অবশ্য এই ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণের সময় দেশের আর্থিক সামর্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, সমাজের গঠনভঙ্গী ও রাষ্ট্রের রীতিনীতি প্রভৃতির প্রতি সম্যক গুরুত্ব দিতে হইবে।

মুখ্যতঃ পরিকল্পনার রূপায়নে তিনটি পথ অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। যথা :—(১) রাষ্ট্রীয় ব্যয়নীতি—অর্থাৎ সরকারকে ব্যয় বরাদ্দের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হইবে। (২)

মূলধন সংগঠন এবং (৩) সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকারণগুলির পর্যালোচনা ; গণসহযোগিতা ও জনগণের উদ্যমের প্রেরণা লাভ করা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে 'পরিকল্পনার রূপদান' সম্পর্কে 'আর্থিক প্রসঙ্গে' যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, প্রয়োজনবোধে এখানে তাহাই উদ্ধৃত করা হইল।

"পরিকল্পনার রূপ ও বাস্তবে রূপদানের সেতু নির্মাতা হবেন নানাস্তরের শাসক ও কর্মীগোষ্ঠী; ডিক্টেটরী শাসনে দলের লোকেদের যে সমর্থন ও কর্মশক্তি পরিকল্পনার রূপায়নে পাওয়া যায়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা না পাওয়াই সম্ভব। বাড়তি ট্যাক্সই হোক, বাড়তি খাটুনিই হোক, ডুমিবন্টন বা শিল্প প্রসারের নীতিই হোক—পদে পদে শুধু বোঝাতে হবে, জনমতের সমর্থন সুদৃঢ় করতে হবে, তাই নয়—সঙ্গে সঙ্গে স্থির পদক্ষেপে পরিকল্পনার কাজ করে যেতে হবে যাতে "দেখে প্রত্যয়" হয়, ফলের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ সহজ হয়।...ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের প্রভাব বাড়তির দিকে বলেই মনে হয়; এখানে সরকার পরিকল্পনার জন্য বহু লক্ষ বেতনভুক, সরকারী-অনুগ্রহ-নির্ভরশীল কর্মী ও সহকারী নিযুক্ত করেন। তাঁদের শুধু পরিকল্পনার তাঁদের অংশটুকু বোঝান বা জানানোই যথেষ্ট হবে না, তাঁদের দৃষ্টিকোণ যাতে সরকারী লক্ষ্যের সঙ্গে বেসুরো না হয়, এটা প্রয়োজন। জনমানসের সঙ্গেও তাঁরা তাল রেখে "অপক্ষ্যে" নেতৃত্ব করেন এও বাঞ্ছনীয়।

উপরতলার অর্থনীতি ও রাজনীতির চেয়েও, গণতন্ত্র যদি সার্থক করতে হয়, তবে নিচতলার বুনিয়াদ পাকা। সর্বজনগ্রাহ্য সর্বজনীন করার প্রয়াস দরকার। স্বাধীনতার আবহাওয়া সৃষ্টির একটা প্রাথমিক কথা ব্রিটিশ আমলের আমলারাজ মনোবৃত্তি ও আচরণের অবসান —গান্ধীজী ও কংগ্রেসও এই কথার একসময় বলেছিলেন। পরিকল্পনার সার্থকতার যাচাই যে কষ্টিপাথরে হবে তাতে শেষ পর্যন্ত চরিত্রের সোনা তাল-সোনার চেয়ে বেশী দামী তা প্রমাণিত হবে কি? রাষ্ট্রের আয়ত্তে শিল্প-জমি-খনির সঙ্গে মানুষের মনও—আর ভারতবর্ষে সে মন এখনও শিক্ষার অভাবে কাঁচামাটি—খুশীমত গড়া যায়। সংখ্যা তত্ত্বের মোহে কি আমরা ভুলবো প্রাথমিক শিক্ষালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির হিসাব রাখতে? চড়া দাম ও বাড়তি মজুরীর প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় কি ভুলে যাব অবসর-উৎসব, আনন্দ-কৃষ্টির অপরিহার্য সম্বন্ধ কে? আর সবশেষে সঙ্কুচিত করব: কি স্বর্ণমৃগের সন্ধানে স্বাধীন নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলিকে? এর কতক প্রশ্ন অতি পুরাতন: জবাবও দেওয়া শক্ত। অবশ্য, বিশ্বাসে কৃষ্ণ হয়ত নিকটতর হতে পারেন—কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গের সম্ভাবনা যাতে না হয় এজন্য তর্কের দরকার। তর্ক, বিচার, বিশ্লেষণ, হিসাব—পরিকল্পনার রূপদানের প্রতি পদক্ষেপে তাই প্রার্থনীয়।"

বলা বাহুল্য পরিকল্পনার রূপায়নে যদি উপরোক্ত নীতি গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে পরিকল্পনার গণসহযোগিতা পাওয়া যাইবে না, আর গণসহযোগিতা ব্যতীত পরিকল্পনা, পরীর কল্পনার পর্যবসিত হইবে, কোনদিন বাস্তবে নামিয়া আসিবে না।

তৃতীয়
পরিকল্পনার
রেখা-রূপ

SELECTED FIRST AND SECOND PLAN ACHIEVEMENTS AND THIRD PLAN TARGETS

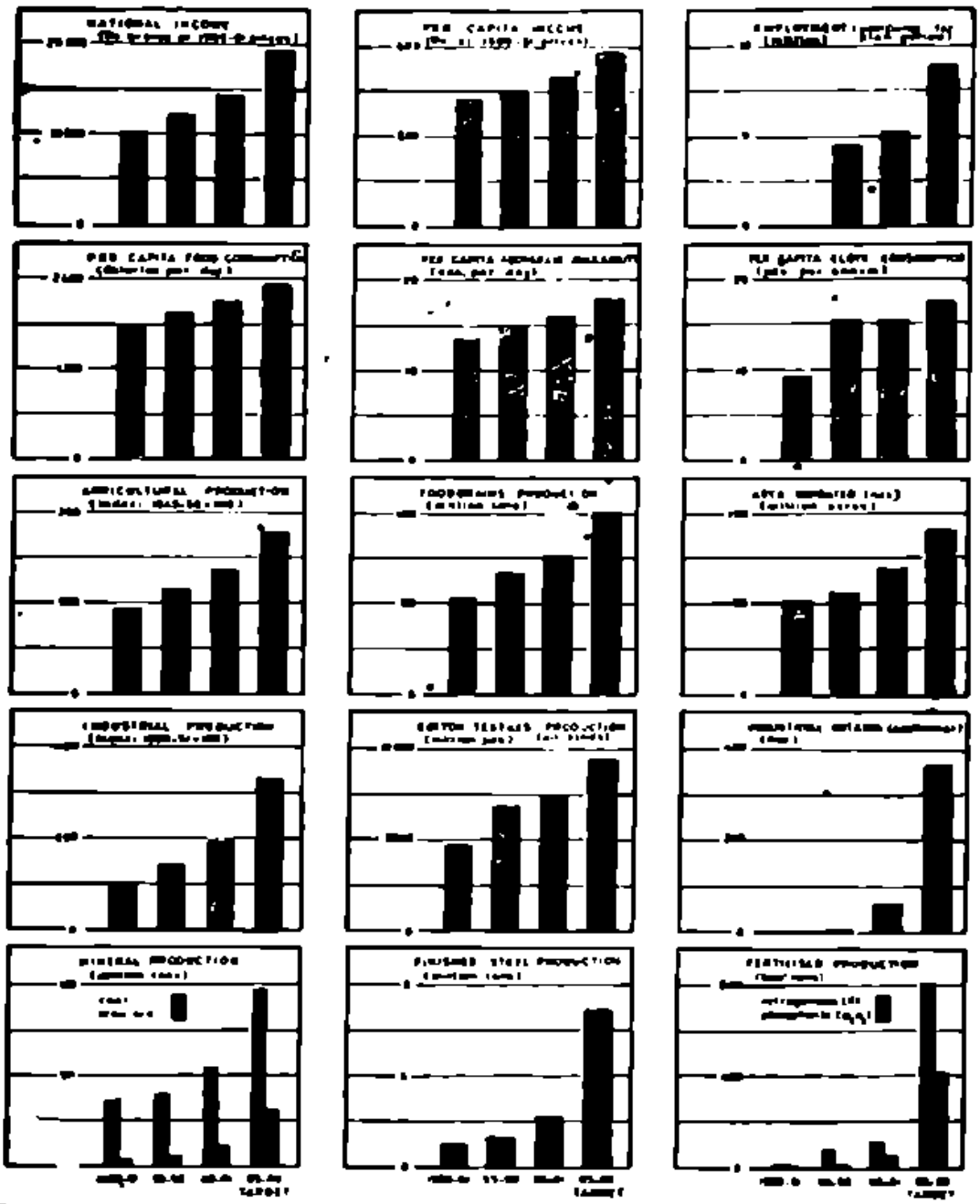

SELECTED FIRST AND SECOND PLAN ACHIEVEMENTS AND THIRD PLAN TARGETS

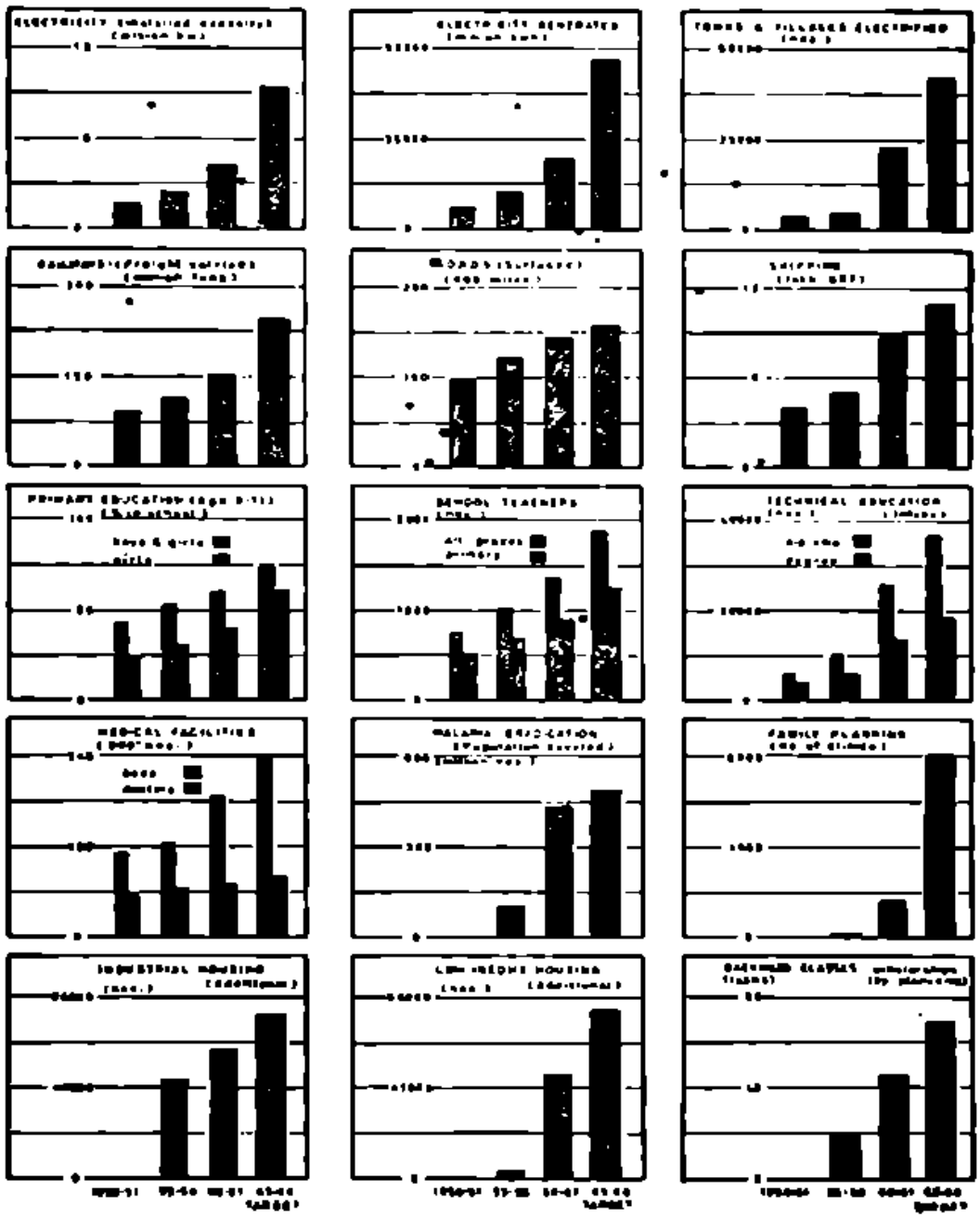

SELECTED ECONOMIC INDICATORS

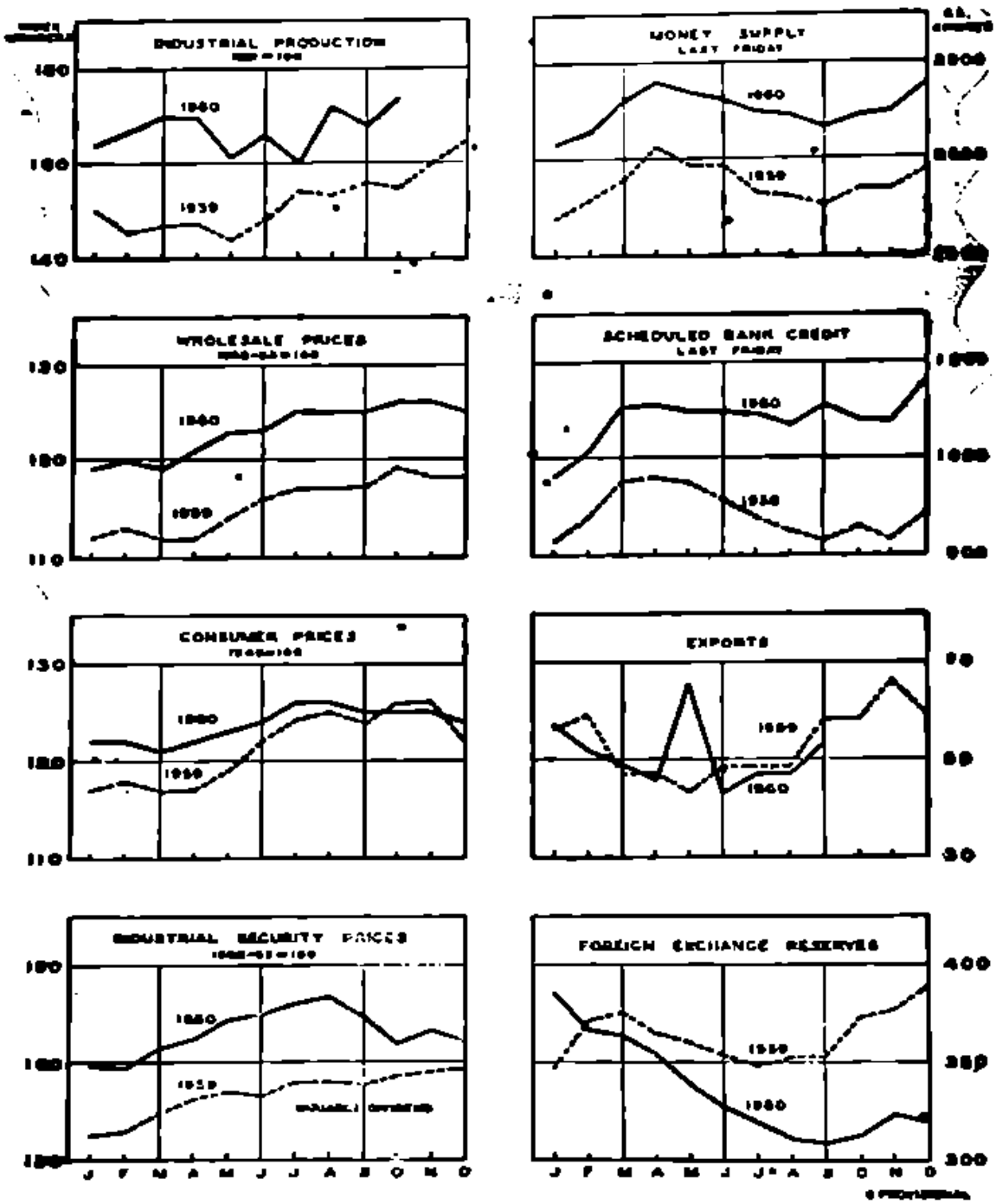

DEPARTMENT OF FINANCE, ECONOMIC DIVISION.

SELECTED ECONOMIC INDICATORS

1950-51 to 1960-61

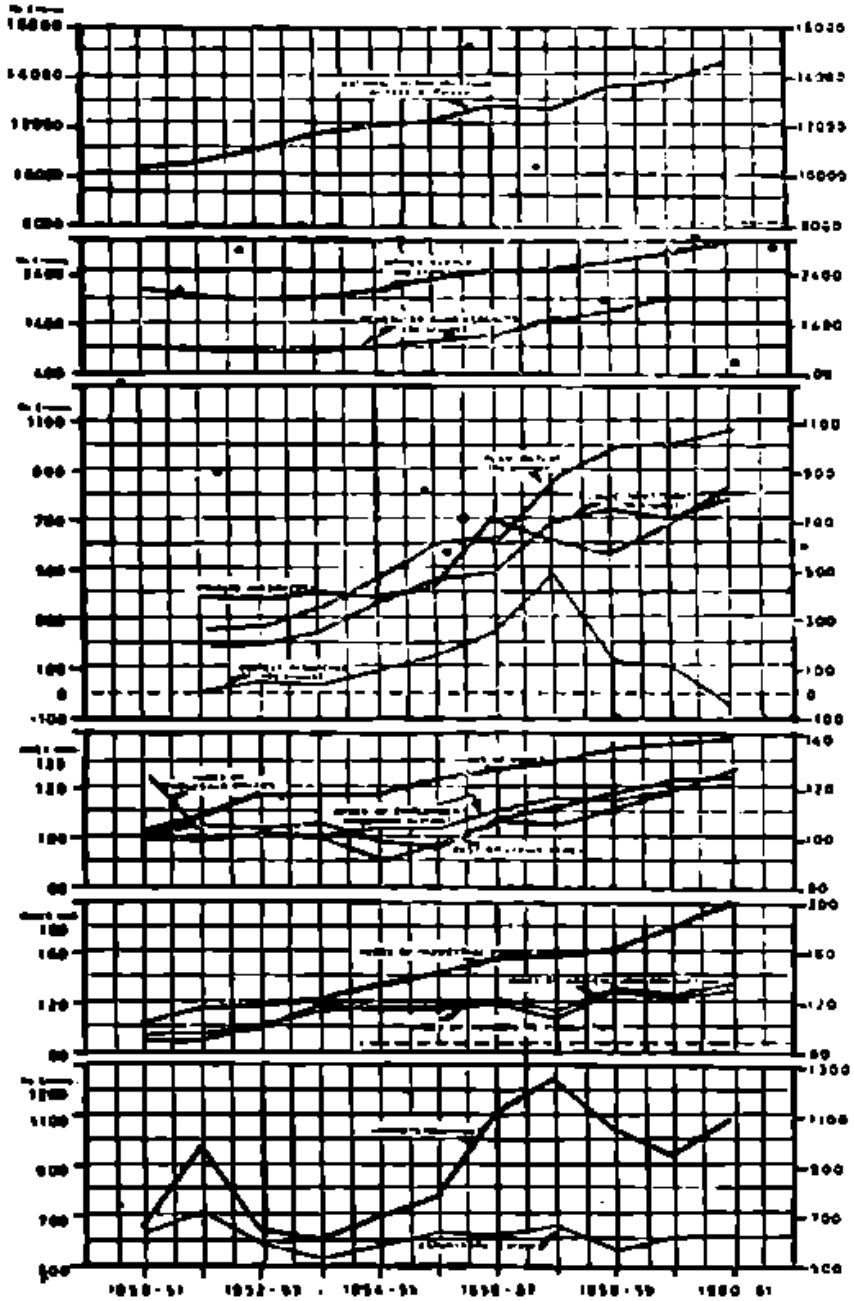

NATIONAL INCOME, INVESTMENT, SAVINGS AND CONSUMPTION EXPENDITURE 1950-51 TO 1975-76

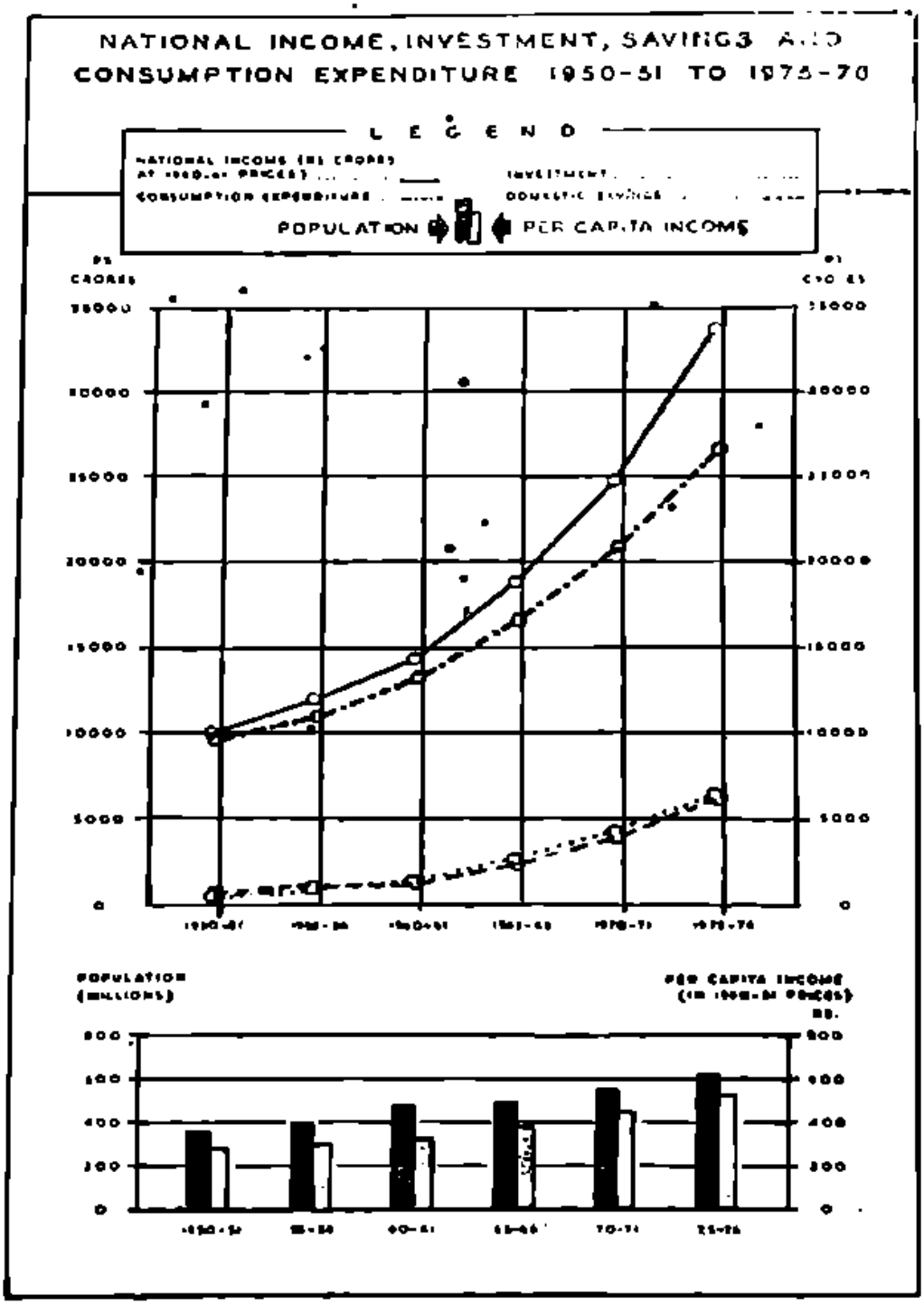

দ্বিতীয় অধ্যায়

[ক] পরিকল্পনার কাঠামো ও ব্যয়-বরাদ্দ

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা আরম্ভ হইয়াছে, সেগুলি সমাপ্ত করা এবং চতুর্থ পরিকল্পনাকালীন উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের গতিবেগ দ্রুততর করার উদ্দেশ্য লইয়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে।

আলোচ্য পরিকল্পনায় কৃষির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন এবং শিল্পের ও রপ্তানীর জন্য কাঁচা মাল বাড়িয়া কৃষিজীবীদের আয় বৃদ্ধি করার চেষ্টাও পরিকল্পনা কমিশন করিয়াছেন। শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্প, যাতায়াত, পরিবহন প্রভৃতি বিষয়ে লাগাতার রাখিয়া পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে। খসড়া পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল নিম্নোক্ত প্রকারের :—

		সরকারী খাতে (কোটি টাকার হিসাবে)		বেসরকারী খাতে	
		ব্যয়	মোট ব্যয়ের শতাংশ	বিনিয়োগ	মোট ব্যয়
১।	কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা	৬২৫	৮·৬	১০০	৭২৫
২।	সমাজ উন্নয়ন ও সমবায়	৪০০	৫·৫	—	৪০০
৩।	মাঝারি ও বড় সেচ	৬৫০	৯·০	—	৬৫০
৪।	শক্তি	৯২৫	১২·৮	৪০	৯৭৫
৫।	গ্রামীণ ও কুটির শিল্প	২২০	৩·৪	২৭৫	৪২৫
৬।	শিল্প ও খনিজ	১৫০০	২০·৭	১০০০	২৫৮০
৭।	যাতায়াত ও যোগাযোগ	১৪৫০	২০·০	২০০	১৬৫০
৮।	সমাজ সেবা	১২৫০	১৭·২	১০৭৫	২৩২৫
৯।	অন্যান্য খাতে	২০০	২·৮	৫০০	৮০০
		৭,২৫০	১০০	৪,০০০	১১,২৫০

সরকারী খাতে ব্যয় ৭২৫০ কোটি টাকার মধ্যে (পরিবর্তিত চূড়ান্ত হিসাবে ৭৪৫০ কোটি টাকা) ৬২০০ কোটি টাকা বিনিয়োজিত হইবে এবং ১০৫০ কোটি টাকা চলতি খাতে (revenue expenditure) ব্যয়িত হইবে। খসড়া পরিকল্পনা অনুসারে মোট সরকারী ব্যয় ৭২৫০ কোটি টাকার মধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রের অংশ প্রায় সমান সমান। পর পৃষ্ঠার তালিকাটি হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে।

[কোটি টাকার হিসাবে]

	মোট ব্যয়	কেন্দ্রের অংশ	রাজ্যের অংশ
১। কৃষি, ক্ষুদ্র সেচ ও গ্রামীণ উন্নয়ন	১০২৫	১৭৫	৮৫০
২। মাঝারি ও বড় সেচ ব্যবস্থা	৫৫০	৫	৫৪৫
৩। শক্তি	৯২৫	১২৫	৮০০
৪। গ্রামীন ও কুটির শিল্প	২৫০	১০০	১৫০
৫। শিল্প ও খনিজ	১৫০০	১৪৭০	৩০
৬। যাতায়াত ও যোগাযোগ	১৪৫০	১২২৫	২২৫
৭। সমাজ সেবা	১২৫০	৩০০	৯৫০
৮। অন্যান্য খাতে	২০০	২০০	—
	৭২৫০	৩৬০০	৩৬৫০

সরকারী ও বেসরকারী খাতে মোট বিনিয়োগ ১০,২০০ কোটি টাকার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন ১৯১৫ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে কেবল মাত্র শিল্পের ও খনিজের জন্যই ১১৯০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। তাই শিল্প ও খনিজ সম্পদের পরিকল্পনাগুলিকে নিম্নোক্ত প্রকারে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

১। যে সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে আরম্ভ হইয়াছে।

২। যে সকল পরিকল্পনার জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির নিশ্চিত আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে।

৩। যে সকল পরিকল্পনা রচনার কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত করার মত বৈদেশিক অর্থের এখনও কোন সুবন্দোবস্ত হয় নাই।

৪। যে সকল পরিকল্পনা রচনার কাজ এখনও শেষ হয় নাই এবং যাহাদের জন্য বৈদেশিক অর্থেরও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এই ধরণের পরিকল্পনাগুলিকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কিনা সে সম্পর্কে এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

৫। যে সমস্ত পরিকল্পনার রূপায়ণ অন্য কোন পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট শিল্পাঞ্চলের সংখ্যা হইবে প্রায় ৩৬০টি। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বৃহদাকার পরিকল্পনার সহিত সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিবে। কৃষি উৎপাদন প্রায় ৫০ হইতে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হইবে। অর্থাৎ গড়ে মাথাপিছু দৈনিক ১৫ আউন্স খাদ্যশস্য ও ৩ আউন্স ডাল ইত্যাদি পাওয়া যাইবে। বৎসরে মাথাপিছু ১৭·৫ গজ কাপড় পাওয়া যাইবে।

পরিকল্পনার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষাবাদ, ভূমিক্ষয় নিবারণ, বন সৃজন প্রভৃতি উপরও উপযুক্ত নজর দেওয়া হইবে। ১৯৬৩ সালের অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত গ্রামে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রসার ঘটিবে। কৃষি উন্নয়নে 'সমবায়'ও উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইবে। ৬ হইতে ১১ বৎসরের শিশুদের বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইবে। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের উপরও নজর দেওয়া হইবে। ১৯৬১-৬১ সালে বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হইবে ৬৫০ লক্ষ। তৃতীয় পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ন চতুর্থ পরিকল্পনার দ্রুত অগ্রগতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

[খ] উৎপাদন লক্ষ্য

তৃতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নোক্ত উৎপাদন লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১০ কোটি টন। এই সময়ে ৯ কোটি একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে।

মূল শিল্পগুলির মধ্যে ইস্পাতের উৎপাদন তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দাঁড়াইবে ৬২ লক্ষ টন। যন্ত্রপাতি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩০ কোটি টাকা। আর পেট্রলজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইবে ১১ লক্ষ টন। ঐ সময় লৌহ ও কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ হইবে যথাক্রমে ৩ কোটি টন ও ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টন। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি ৭ লক্ষ কিলোওয়াটে পরিণত হইবে।

১৯৬১-৬৬ সালে মিলে উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪৮০ কোটি গজ এবং তাঁত, খাদি ও বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের উৎপন্ন হইবে ২৫০ কোটি গজ। ফলে মাথাপিছু কাপড় ব্যবহারের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৭·২ গজ। তখন মাথাপিছু দৈনিক খাদ্য ব্যবহারের পরিমাণ হইবে ২০০০ ক্যালোরী।

পরিবহনের মধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে রেলপথের মাল বহনের পরিমাণ দাঁড়াইবে ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টন। তখন ভারতের ১০ কোটি ৯০ হাজার টনের জাহাজ থাকিবে। তৃতীয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা করিয়া ১৯৭০-৭১ সালের জন্য নিম্নোক্ত লক্ষ্য ধার্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ইস্পাত ১ কোটি ৮০ লক্ষ হইতে ১১ কোটি ১০ লক্ষ টন; কাঁচা লোহা ৩০ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ টন; এ্যালুমিনিয়াম ২ লক্ষ ৩০ হাজার হইতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন, কয়লা ১৭ কোটি হইতে ১৮ কোটি টন, সিমেন্ট ২ কোটি ৪০ লক্ষ হইতে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টন, যন্ত্রপাতি ১৬০০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ শক্তি ২ কোটি ১০ লক্ষ হইতে ২ কোটি ৩০ লক্ষ কিলোওয়াট, তৈলশোধন ১ কোটি ৮০ লক্ষ হইতে ৩ কোটি টন, রেলওয়ে মাল বহন ৩৮ কোটি হইতে ৪২ কোটি টন, খাদ্যশস্য ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টন, রপ্তানী ১৩০০ থেকে ১৪০০ কোটি টাকা।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা

পরিকল্পনা কমিশনের বিবরণী হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে কোন আদর্শগত পার্থক্য নাই। প্রথম পরিকল্পনায় যাহা বলা হইয়াছিল, তৃতীয় পরিকল্পনায় তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ একত্র করিলে তৃতীয় পরিকল্পনার মোট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থ-সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সকল অসুবিধা ছিল, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে তাহা আরও জটিল হইয়াছে: একমাত্র আশার কথা বৈদেশিক সাহায্যের আশ্বাস। কিন্তু তাহাও কতটা পাওয়া যাইবে এবং কি সর্তে পাওয়া যাইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত। উপরন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ঋণের বোঝা ঋণের বোঝা বর্তমান। বৈদেশিক সাহায্য বৈদেশিক মুদ্রায় পাওয়া যাইবে এবং প্রধানতঃ মূলধনী মাল অথবা কারিগরী সাহায্যের মারফতে। এগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন আভ্যন্তরীন অর্থ সরবরাহের। এই অর্থ সরবরাহের উৎস যদি করভার বৃদ্ধি অথবা ঘাটতি ব্যয় নীতি (নোট ছাপানো) তথা মুদ্রাস্ফীতি হয়, তবে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সংসারে—

একরি সংসারে, হ'বে মরিবারে,
শুধু একা নয়, সপরিবারে।

তিনটি পরিকল্পনার লগ্নীর তুলনামূলক হিসাব

	প্রথম পরিকল্পনা চূড়ান্ত হিসাব	দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রাথমিক ব্যয়বরাদ্দ	দ্বিতীয় পরিকল্পনা চূড়ান্ত হিসাব	তৃতীয় পরিকল্পনা
সরকারী উদ্যোগের ব্যয়বরাদ্দ	১৯১০	৪৮০০	৪৬০০	৭৫০০
সরকারী উদ্যোগের বিনিয়োগ	১৫৬০	৩৮০০	৩৬৫০	৬৪৫০
বে-সরকারী উদ্যোগের বিনিয়োগ	১৮০০	২৪০০	৩১০০	৪০০০
মোট বিনিয়োগ	৩,৩৬০	৬,২০০	৬,৭৫০	১০৪৫০

সরকারী ক্ষেত্রের অর্থ সংস্থান [কোটি টাকার হিসাবে]

	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	তৃতীয় পরিকল্পনা
চলতি রাজস্বের উদ্বৃত্ত	১০০	৫৫০
রেলবিভাগের রাজস্বের উদ্বৃত্ত	১৫০	১০০
বিভিন্ন সরকারী বিনিয়োগ হইতে	...	৪৫০

ঋণ	৮০০	৮০০
ক্ষুদ্র সঞ্চয়	৩৮০	৬০০
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, উন্নয়ন কর, স্টীল ইকোনাইজেশন ফাণ্ড প্রভৃতি মূলধনী আয়	২১৩	৪৪০
অতিরিক্ত কর	১০০০	১৭১০
বৈদেশিক সাহায্য	১৮২	২২০০
ঘাটতি বাজেট	১১৭৫	৪৫০
মোট	৪৮০০	৭,৪০০

সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ (কোটি টাকার হিসাব)

	দ্বিতীয় পরিকল্পনা		তৃতীয়
	প্রাথমিক বরাদ্দ	সংশোধিত হিসাব	পরিকল্পনা
কৃষি ও সেচ	২৭৫	৬৭৫	৮৫০
শক্তি	৪০	৪০	৫০
যানবাহন	৮৫	১০৪	২৫০
গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প	১০০	২২৫	৩২৫
বৃহৎ এবং মাঝারী শিল্প ও খনিজ দ্রব্য	৪৭৫	৭২৫	১১০০
গৃহনির্মাণ এবং অন্যান্য ইমারতী কার্য	৯২২	১০৩০	১১২৫
মজুদ	৪০০	৪০০	৬০০
মোট	২৪০০	৩৩০০	৪৩০০

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষি ও গ্রামীন অর্থনীতি

প্রথম পরিকল্পনার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কৃষির উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় শিল্পের উপরে। শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আজ তাই অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। কৃষির জন্য ইতিপূর্বে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হইয়াছে, (উদাহরণ স্বরূপ, বহুমুখী নদীর পরিকল্পনা প্রভৃতির কথা বলা যায়) তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার যাহাতে করা যায়, সেদিকে পরিকল্পনা কমিশন বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। কৃষির উৎপাদন লক্ষ্য রাষ্ট্র বা রাজ্যের ভিত্তিতে স্থির না করিয়া গ্রামের ভিত্তিতে করা হইবাছে। গ্রাম্য পঞ্চায়েত, সমবায় ও জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থাসমূহ গ্রামীন কৃষি পরিকল্পনা রূপায়নের ভার লইবেন।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে চারটি মুখ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে সেগুলি হইল—(১) সেচ (২) ভূমি সংরক্ষণ, শুষ্ক কৃষি ও অকর্ষিত ভূমিকে চাষযোগ্য করা (৩) সার এবং (৪) উন্নত ধরণের লাঙ্গল ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ।

বড় ও মাঝারি ধরণের পরিকল্পনাগুলি হইতে ১৩০ লক্ষ একর জমিতে জল সেচ করা যাইবে। ছোট সেচ ব্যবস্থা হইতে ১৩৫ হইতে ১৪০ লক্ষ একর জমিতে জল সেচ করা হইবে। আর দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রায় ৭০০ লক্ষ একর জমিতে জল সেচ করা যাইবে। আর তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সংখ্যা হইবে প্রায় ৯০০ লক্ষ একর।

যে সকল স্থানে সেচের ব্যবস্থা নাই এবং কৃষিকার্য অপ্রচুর, সেই সকল স্থানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভূমি সংরক্ষণ করিয়া শুষ্ক কৃষির দ্বারা ৪০০ লক্ষ একর জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা যাইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে নাইট্রোজেন সার ১০ লক্ষ টন এবং ৪০০,০০০ হইতে ৫০০,০০০ টন ফসফেট সার ব্যবহৃত হইবে। বর্তমানে নাইট্রোজেন ব্যবহারে পরিমাণ সার প্রায় ৩৬০,০০০ টন এবং ফসফেট সার ৬৭,০০০ টন মাত্র। ইহা ব্যতীত প্রায় ৫০০ লক্ষ একর জমিতে সবুজ সার ব্যবহার করা যাইবে।

উন্নত ধরণের ও বিভিন্ন ধরণের বীজের সুষ্ঠু সরবরাহের জন্য প্রতিটি সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রায় ২৫ একর জমি লইয়া বীজাগার স্থাপন করা হইতেছে। বর্তমানে এইরূপ বীজাগারের সংখ্যা প্রায় ৪০০০। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহাদের সংখ্যা প্রয়োজন অনুসারে বৃদ্ধি করা হইবে। কীট পতঙ্গ নিবারণ এবং শস্যাদির রোগ নিবারণ ব্যবস্থা যেভাবে জোরদার করা হইতেছে, তাহাতে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৭৫০ লক্ষ একর জমি উপকৃত হইবে বলিয়া মনে হয়।

কৃষি গবেষণা সংস্থা (Council of Agricultural Research) উন্নত ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি সম্পর্কে গবেষণা করিতেছে। এই সকল যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা কৃষকদের বুঝাইয়া দেওয়া হইবে এবং গ্রামের কামারদের শিখাইয়া দেওয়া হইবে কিভাবে এই সব যন্ত্র তৈয়ারী করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির জন্য সরাসরি ৬২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহা ব্যতীত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ, যেমন, সমাজ উন্নয়ন ও সমবায়ের জন্য ৪০০ কোটি টাকা, বড় মাঝারি ধরণের সেচের জন্য ৬৫০ কোটি টাকা এবং সার উৎপাদনের জন্য ২৪০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন লক্ষ্যটি নিম্নোক্ত প্রকারের :—

পণ্য	একক	উৎপাদন লক্ষ্য
খাদ্যশস্য	১০ লক্ষ টন	১০০-১০৫

তৈলবীজ	১০ লক্ষ টন	২-৯·৫
ইক্ষু	,,	৯·০-৯·২
তুলা	১০ লক্ষ বেল	৭·২
পাট	,,	৬·৫
চিনি	হাজার টন	৬·২
তামাক	,,	৩২৫
চা	১০ লক্ষ পাউণ্ড	৮৫০
রবার	,,	৪৪

পরিকল্পনার ব্যবহারিক দিক আলোচনা করিলে উক্ত উৎপাদন লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হইবে কি না তাহা বিশেষরূপে বিবেচ্য। আমাদের কৃষক-সম্প্রদায় এত নিঃস্ব যে তাহাদের পক্ষে জমির জন্য কোন রূপ অর্থ ব্যয় বহু ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না; এত অশিক্ষিত যে কোন বৈজ্ঞানিক প্রথা ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে স্বভাবজাত অনাগ্রহ আছে। আমেরিকার যান্ত্রিক কৃষির প্রবর্তন এদেশে সম্ভব নয়। রাশিয়ার মত সরকারী বা বেসরকারী উদ্যমে যৌথ চাষবাদ-এর পক্ষেও বাধা অনেক। তাই, কৃষি উন্নতির জন্য বর্তমানে জাপানী পদ্ধতির অনুসরণ করাই যুক্তি-সঙ্গত বলে মনে হয়। "সামুরাই" পরিবারগুলির মত ভারতীয় কৃষিবিদ্‌দের তাত্ত্বিক আলোচনা ত্যাগ করিয়া গ্রামে গিয়া কৃষকদের সহিত একত্রে কাজ করিতে হইবে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সহিত একত্রে কর্ষিত নূতন কৃষক্ষেত্রে এইবার আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করিতে হইবে।

সমাজ উন্নয়ন—সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র বলিতে বুঝায় এমন একটি স্থান যেখানে সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনা পঞ্চায়েত ও গ্রাম্য সমবায়ের সাহায্যে রূপায়িত হয়। কেন্দ্রের অন্তর্গত সমস্ত জনসম্পদ ও আর্থিক সম্পদের যথোচিত ব্যবহার করিয়া সুষ্ঠু উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই ইহার উদ্দেশ্য।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রবর্তন হয় প্রায় আট বৎসর পূর্বে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৪০০,০০০ গ্রাম লইয়া ৩১০০টি কেন্দ্র স্থাপিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় ১০০০টি কেন্দ্রের বয়স হইবে পাঁচ বৎসরেরও বেশী। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১০০০টি কেন্দ্রের কার্যকাল হইবে ১০ বৎসরেরও বেশী এবং ২০০০টি কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হইবে। অবশিষ্ট ২১০০টি কেন্দ্রের প্রথম পর্যায় চলিতে থাকিবে।

গত তিন বৎসর যাবৎ সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত ভূমিদান আন্দোলনের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চলিতেছে। গ্রামে গাঁথা ভারতের প্রতিটি লোককে ক্রমশঃ এই উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। এই পরিকল্পনায় গ্রামের বেকার ব্যক্তিগণের কর্মসংস্থান হইবে এবং আধা-বেকারগণের অবসর সময়ের কর্মসংস্থান হইবে।

সমবায়—জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিলের ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে গৃহীত সমবায় সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, গ্রামাঞ্চলে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাথমিক কেন্দ্র হিসাবে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায় সমিতিগুলি মুখ্যতঃ কৃষির উন্নতির জন্য যন্ত্রপাতি, সার ও মাঝারি মেয়াদের ঋণ, কৃষিপণ্য বাজারজাত করণের ব্যবস্থা করিবে। এ সম্পর্কে ভবিষ্যতের কার্যক্রমটি নিম্নোক্ত প্রকারের :—

(ক)	প্রাথমিক গ্রামীণ সমিতির সংখ্যা	২·৫ লক্ষ
(খ)	সভ্যসংখ্যা	৪০০ ,,
(গ)	ঋণ দানের পরিমাণ	
(১)	স্বল্পমেয়াদী	৪০০ কোটি
(২)	মাঝারি মেয়াদী	১৬০ ,,
(৩)	দীর্ঘ মেয়াদী	১১৫ ,,
(ঘ)	প্রতি সভ্যকে দেয় গড় ঋণ পরিমাণ	১২০ টাকা
(ঙ)	সমিতির গড় মূলধন	৪৮০০০ ,,

কৃষি ও গ্রামীন অর্থনীতির পরিপূরক হিসাবে পশু পালন, ডেয়ারী, মৎস্য, মৎস্য চাষ, বন ও ভূমি সংরক্ষণের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। এগুলির মাধ্যমে পূর্ণ ও আংশিক কর্ম সংস্থান করিয়া দরিদ্র পরিবারগুলির উপার্জন বৃদ্ধি ও খাদ্য সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে।

সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কাজ হইবে কৃষি উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করার জন্য পল্লীসমাজকে সংগঠিত করা। পল্লী সমবায় ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কৃষি পরিবারগুলিকে কৃষিকার্যে অধিকতর উৎসাহ ও জরুরী মনোভাব লইয়া ব্রতী হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পল্লীর উৎপাদন কর্মসূচী রচনা করিতে হইবে। কৃষকেরা যাহাতে সময়মত উপযুক্ত পরিমাণ সার পাইতে পারে তদুদ্দেশ্যে অধিকতর সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশে পশু হাসপাতাল ও ডিস্‌পেন্‌সারির সংখ্যা দাঁড়াইবে ৮ হাজার, ১৯৬৯-৭৪ সালের মধ্যেই দেশের সকল গবাদি পশুকে রোগ প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হইবে। এক লক্ষাধিক অধিবাসী সমন্বিত সহরগুলিতে এবং নূতন নূতন শিল্পনগরগুলিতে ৫৫টি দুগ্ধ সরবরাহের কর্মসূচী রূপায়িত করা হইবে। তাহা ছাড়া, ঘৃত-মাখনের ৯টি কারখানা, গুঁড়া দুধের ৪টি কারখানা, পনীরের ২টি কারখানা স্থাপন করা হইবে। ডেয়ারী শিল্প উন্নয়নের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

দেশে বর্তমানে অনুমান ২১০০টী মৎস্য বন্দর রহিয়াছে। ঐগুলির সদস্য সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মৎস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধির জন্য এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সেচ ও শক্তি

প্রথম পরিকল্পনাকাল হইতেই সেচ ও শক্তির উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কারণ সুলভ শক্তি ব্যতীত বিরাট শিল্পোন্নয়ন সম্ভব নয়। দামোদর উন্নয়ন পরিকল্পনা, ভাকরা-নাঙ্গাল, হীরাকুদ, তুঙ্গভদ্রা, নাগার্জুন সাগর প্রভৃতি নদী পরিকল্পনাগুলি সেচ ও শক্তি সরবরাহের জন্যই রচিত হইয়াছে। ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা কৃষির উন্নতির জন্য এবং সুলভ শক্তি সরবরাহ দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য।

(ক) সেচ—১৯৫০ সালের হিসাব মতে এদেশে সেচযোগ্য জল-সম্পদের পরিমাণ হইল ৪৫০০ লক্ষ একর ফুট। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এই সম্পদের মধ্যে মাত্র ৭৬০ লক্ষ একর ফুট অর্থাৎ শতকরা ১৭ ভাগ কাজে লাগান হইত। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শেষে প্রায় ১১৯০ লক্ষ ফুট অর্থাৎ প্রায় ২৬% স্রোতকে কাজে লাগান হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ হইবে প্রায় ৩৫%।

প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে বড় ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থা হইতে ২২০ লক্ষ একর জমিতে জল সেচ হইত। অনুমান করা হইয়াছে পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে (১৯৭৪-৭৬) ইহার পরিমাণ ৮৫০ হইতে ৯০০ লক্ষ একর হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া রচনাকালে এই দূরপ্রসারী লক্ষ্যের বিষয় স্মরণ রাখা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় যে ধরণের সেচ ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হইবে সেগুলি হইল :—

(১) দ্বিতীয় পরিকল্পনার আরব্ধ কর্ম

(২) জল নিকাশী পরিকল্পনা

(৩) মাঝারী সেচ ব্যবস্থা

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যে নদী পরিকল্পনাগুলির খসড়া করা হইয়াছে, সেগুলি সম্পূর্ণ করিতে আরও ৬২০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহার মধ্যে ৪৭০ কোটি টাকা তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এবং অবশিষ্ট ১৫০ কোটি টাকা চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ব্যয়িত হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কয়েকটী নূতন নদী পরিকল্পনার কাজও আরম্ভ করা হইবে। যেমন পাঞ্জাবের শতদ্রু নদী পরিকল্পনা, উত্তর প্রদেশের গণ্ডক নদী পরিকল্পনা প্রভৃতি। নূতন পরিকল্পনাগুলির জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলনিকাশ, সমুদ্র দ্বারা ভূমিক্ষয় নিবারণ প্রভৃতি খাতে আলোচ্য সময়ে ৮০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহার পরিমাণ ছিল

৬০ কোটি টাকা। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সেচ ব্যবস্থার জন্য যে ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহা নিম্নোক্ত প্রকারে ব্যয় করা হইবে :—

বিষয়	ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকার হিসাবে)
(১) সেচ	
চলতি পরিকল্পনা	৪৭০
নূতন পরিকল্পনা প্রভৃতি	১০০
মোট	৫৭০
(২) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলনিকাশ, সমুদ্র দ্বারা ভূমিক্ষয় নিবারণ	৮০
মোট	৬৫০

৬৫০ কোটি টাকার মধ্যে ৪৫ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। জিনিসপত্রের দাম ও মজুরীর হার বৃদ্ধি পাওয়ায় নূতন পরিকল্পনাগুলির রূপায়ন ব্যয় ও পুরাতন পরিকল্পনাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে প্রায় সমস্ত পরিকল্পনাগুলিতেই ব্যয় অপেক্ষা আয় কম হইতেছে। অর্থনৈতিক কমিশন (Finance Commission) এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করায় পরিকল্পনা কমিশন রাজ্যসরকারগুলিকে এসম্পর্কে তিনটি কার্যসূচী অনুসরণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন—

(১) সমাপ্ত সেচ পরিকল্পনাগুলির যথোচিত সদ্ব্যবহার।

(২) জলকরের হার পুনর্নির্ধারণ এবং বাধ্যতামূলক জলকরের প্রবর্তন।

(৩) উন্নয়ন করের প্রবর্তন।

সেচ পরিকল্পনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার অনেকগুলি বিভাগের যৌথ প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। এই বিভাগগুলি হইল সেচ, কৃষি, রাজস্ব, সমাজ উন্নয়ন, সমবায় প্রভৃতি। প্রতিটি গ্রামে যাহাতে উপযুক্ত সময়ে সেচের জল পাওয়া যায় তাহার জন্য বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে। যে সকল রাজ্যে ভাল কর আদায়ের ব্যবস্থা নাই, সেই সকল রাজ্যে জলকরের প্রবর্তন করা হইবে। চাষের জন্য যে বৎসর জলের ব্যবস্থা করা হয়, তাহার ২।৩ বৎসর পর হইতে উন্নয়ন কর আদায় করা হয়। কিন্তু এই আদায়ের পরিমাণ কোন ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক হয় না। অবস্থাবিশেষে জলকর ও উন্নয়ন কর আদায়ের ভার গ্রামীন সংস্থাগুলির হাতে দেওয়া হইবে।

বর্তমানে প্রায় সকল রাজ্যেই সেচ ব্যবস্থাগুলির জন্য লোকসান হইতেছে। সেচ ব্যবস্থার সুযোগ যাহাতে উপযুক্ত ভাবে গ্রহণ করা হয় তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। সেচ করের সংশোধন করা প্রয়োজন। সেচ ব্যবস্থা পরিচালনার ব্যয় এবং ঋণের দরুণ দেয় টাকা যাহাতে মিটান যায় সেই দিক লক্ষ্য রাখিয়াই সেচ করের হার নির্ধারণ করিতে হইবে। বর্তমানে প্রায় সকল রাজ্যেই সেচকরের হার নির্ধারণ করিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশনের মতে যে সকল অঞ্চলে সেচ কর বাধ্যতামূলক নহে, সেখানে সেচব্যবস্থাযুক্ত সমস্ত অঞ্চলে বাধ্যতামূলকভাবে তাহা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্রমশঃ

ভারতে ভূ-আর্থিক শাসনাঞ্চল

অধ্যাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

ভারত এক বিরাট দেশ। আয়তনে ও লোকসংখ্যায় উভয় ক্ষেত্রে দেশটির স্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থবিদের মতে আয়তনের তুলনায় ভারতের লোকসংখ্যা অনেক অধিক। দেশের সম্পদ ও লোক সংখ্যার মধ্যের মধ্যে অনুকূল সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। প্রশ্ন হইতেছে, এই বিরাট দেশের শাসনাঞ্চল কিভাবে নির্ধারিত হইবে। পরিবেশের আর্থিক সম্বল কতটা এবং উহা বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে কতজন ভোগ করিতে পারে। উহা স্থির করিয়া শাসনাঞ্চল নির্ধারিত হইলে, দেশের সর্বত্র আধুনিক পরিকল্পিত উন্নয়নে সাম-ঞ্জস্য থাকিবে। পরিবেশের মধ্যে রহিয়াছে প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব ও উহার কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। পরিবেশের অপ্রাকৃতিক সম্পদের দিকে তাকাইলে, প্রথমেই মানব ও উহার ভাষার কথা মনে পড়ে। ভারত নানা ভাষা-ভাষীর দেশ। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ভাষাকে ভিত্তি করিয়া শাসনাঞ্চল সীমান্বিত করিলে, দেশ শতধা বিভক্ত হইবে। কূপ-মণ্ডূকতা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে এবং গঠনমূলক কার্যে নানা অন্তরায় দেখা দিবে। বর্তমানে প্রয়োজন মানব শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ এই দুইয়ের আর্থিক সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দেশের শাসনাঞ্চল সীমান্বিত করা। ঐরূপ পরিস্থিতিতে প্রত্যেক অঞ্চলের আয়তন বৃহৎ হইলেও একদিকে শাসন-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবে এবং অপরদিকে বিশেষ বিশেষ আর্থিক বিষয়ে অঞ্চলগুলি সঙ্ঘবদ্ধ থাকায় পারস্পরিক আদান-প্রদান ঘনিষ্ঠতার ও আন্তরিকতার সহিত সাধিত হইবে। সেই সঙ্গে একক বোধের বীজ রোপিত হইবে এবং বিচ্ছেদের ভাব বা একের প্রাধান্য প্রভৃতি রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতার স্থান কোথাও থাকিবেনা। প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীরা যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাইবার সুবিধা পাইবে, তেমন বাজার বুঝিয়া উদ্বৃত্ত সামগ্রীর পরিবহণ ও পণ্টন নিম্ন নিজ আয়ত্বে রাখিতে পারিবে। ভৌগোলিক ও আর্থিক নীতিতে ভারত-বিভাগে পরিকল্পিত উন্নয়ন আশাতীত শ্রী-সম্পন্ন হইবে। ভূ-আর্থিক বা ভবার্থিক (Geonomic) শাসনাঞ্চল নির্ধারণ করিতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ঐ সমস্ত বিষয়ের মূলে রহিয়াছে—মানব ও আঞ্চলিক সম্পদ।

উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, মধ্যে নদীবাহিত সমভূমি এবং দক্ষিণে মালভূমি ও উপকূল লইয়া ভারতভূমি গঠিত। ভারতের ঐ চারটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে লোকসংখ্যা সম-সংখ্যক নহে। সম্পদের দিকে পার্থক্য যথেষ্ট। হিমালয় পর্বতমালায় লোকসংখ্যা অল্প, সম্পদ প্রচুর এবং রাজনৈতিক অবস্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সম্পদ উদ্ধারে এবং গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অটুট রাখিতে লোকবল ও অর্থবল উভয়ই প্রয়োজন। সেখানে প্রথমেই

প্রয়োজন উন্নত ধরণের পরিবহন ব্যবস্থা। উহাতে প্রাথমিক খরচ যথেষ্ট। সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে দেখা যায়, উত্তর-ভারতে পার্বত্য-অঞ্চল ও নদীবাহিত সমভূমি এই দুই প্রাকৃতিক অঞ্চলকে একটি অঞ্চল হিসাবে গণ্য করিলে, সর্ববিষয়ে আশাতীত ফল পাওয়া যাইবে।

উত্তর ভারতে এই অঞ্চলটিতে রহিয়াছে—বর্তমান আসাম, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ, নাগাভূমি, ত্রিপুরা, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর-প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাব এবং জম্মু-কাশ্মীর-নামক রাজ্যগুলি। এই বিরাট অঞ্চলে নানা ভাষা প্রচলিত রহিয়াছে। লোকসংখ্যা যথেষ্ট এবং সম্পদ নানা ধরণের। এই বৃহৎ অঞ্চলটিকে লোকসংখ্যা ও সম্পদ হিসাবে দুই বিশেষ ভূ-আর্থিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। উহারা সাধারণ দিক অনুযায়ী—পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল। অঞ্চল দুইটির প্রত্যেকটিতে সম্পদের ও লোকসংখ্যার বৈচিত্র্য যথেষ্ট। উহারা প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

উত্তর ভারতের এই দুই ভূ-আর্থিক অঞ্চলের কথা আলোচনায় কৈন্দ্রীয় শাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলি বাদ দিয়া পূর্বাঞ্চলে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্য এবং পশ্চিমাঞ্চলে উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু-কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্যাঞ্চল ধরা হইল।

পূর্বাঞ্চল

রাজ্য	বর্তমান লোকসংখ্যা লক্ষ	আয়তন হাজার বর্গমাইল	আবাদী জমি লক্ষ একর	জলসেচ খাদ্যশস্য জমি লক্ষ একর	তুলা উৎপাদন লক্ষ টন	ইক্ষু উৎপাদন লক্ষ টন	তৈলবীজ উৎপাদন লক্ষ টন	পাট উৎপাদন লক্ষ বেল
আসাম	৯০·৪	৮৪·৯	৬৩	৪·৫	১৭·৭	০·৯	১·০	৮·০
পশ্চিমবঙ্গ	২৬৩·০	৩৩·৯	১৪৩	৩০·৬	৫২·২	—	১·৩	১৯·৯
বিহার	৩৮৭·৮	৬৭·২	২৬৯	১৭·২	৫২·৬	০·০৬	৬·৯	৮·৪
পূর্বাঞ্চলের মোট	৭৪১·২	১৮৬·০	৪৭৫	৪৩·০	১৩২·৫	·১৫	৯·২	৩৬·৩
ভারতের মোট	৩৬১১·৬	১২৫·৮	৩১৪৮·৫	২৫৫·৪	৭৬৯·৪	৫০·২	৮০·২	৭০·৮

পশ্চিমাঞ্চল

রাজ্য	বর্তমান লোকসংখ্যা লক্ষ	আয়তন হাজার বর্গমাইল	আবাদী জমি লক্ষ একর	জলসেচ খাদ্যশস্য জমি লক্ষ একর	তুলা উৎপাদন লক্ষ টন	ইক্ষু উৎপাদন লক্ষ টন	তৈলবীজ উৎপাদন লক্ষ টন	পাট উৎপাদন লক্ষ বেল
উত্তর-প্রদেশ	৬৩২·২	১১৩·৪	৪১৪·০	৩৯·৯	১৩৫·৪	·৫	৩৪	১১·৮	·৯
পাঞ্জাব	১৬১·৩	৪৭·১	২২১·৬	২৩·৩	৬০·০	৯·০	৭·৮	১·৯	—

হিমাচল প্রদেশ	১১·১	১০·৯	১০·৪	·৪	২·৩	—	—	·১	—
জম্মু কাশ্মীর	৪৪·১	৮৬·০	১৮·৫	·৯	৪·৯	—	—	—	—
আঞ্চলিক মোট	৮৪৩·৭	২৪৭·৫	৭৬৪·৫	৬৪·৫	২০২·৬	৯·৫	৪২·৮	১৩·৮	·৯

পূর্ব কথিত দুই ভূ-আর্থিক অঞ্চলে খনিজ সম্পদ ও শ্রমশিল্প লক্ষ্য করিবার বিষয়। পূর্বাঞ্চল খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। কয়লা, খনিজ লৌহ, খনিজ তাম্র বকসাইট, মানবিক ধাতু, চুণাপাথর ইত্যাদি সামগ্রী সেখানে আকরিত হয়। পশ্চিমাঞ্চলে খনিজ সম্পদের অভাব রহিয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলে সামান্য সম্পদ থাকিতে পারে। উহার অবস্থান এখনও জানা নাই। বৃহৎ ও মাঝারি শ্রমশিল্পে পূর্বাঞ্চল বেশ অগ্রণী। পূর্বাঞ্চলে কুটীর শিল্পে তাঁত সামগ্রী, তৈজস পত্র, সাবান, বিলাস দ্রব্য, বাঁশ ও বেতের সামগ্রী প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া নানা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হয়। পশ্চিমাঞ্চলে মাঝারি শ্রমশিল্প ও কুটীর শিল্প শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেখানে বয়ন শিল্প ও চিনির কারখানার প্রাধান্য রহিয়াছে। কুটীর শিল্পে পশম সামগ্রী, কাঠের উপর খোদাই কার্য, তাঁতশিল্প ও তৈজস পত্র নির্মিত হয়। ইহা ছাড়া আতর, গোলাপ জল, সুগন্ধি মাদক দ্রব্য ও সূঁচের কার্য বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে। উভয় অঞ্চলের সমভূমিতে পরিবহন উন্নতধরণের। সেখানে উন্নয়নের সুযোগ যথেষ্ট রহিয়াছে।

ভারতের অবশিষ্ট অংশ দক্ষিণাপথ ও রাজস্থান লইয়া গঠিত। ভারতের ঐ ভূভাগকে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভূ-আর্থিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়। অবস্থান-অনুযায়ী, উহারা দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ, ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলটি উড়িষ্যা ও অন্ধ্র প্রদেশ এই দুই রাজ্য লইয়া গঠিত। দক্ষিণ অঞ্চলটি গঠিত হইয়াছে—বর্তমান মাদ্রাজ, মহীশূর ও কেরালা নামক তিন রাজ্য লইয়া; মধ্য অঞ্চল—মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র রাজ্য লইয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে রহিয়াছে গুজরাট ও রাজস্থান নামক রাজ্য দুইটি। উহাদের প্রত্যেকের সংখ্যাতথ্য নিম্নে লিখিত হইল—

দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল

রাজ্য	লোকসংখ্যা লক্ষ	আয়তন হাজার বর্গমাইল	মোট আবাদী জমি লক্ষ একর	জলসেচ খাদ্যশস্য উৎপাদন লক্ষ টন	তুলা উৎ- পাদন লক্ষ বেল	ইক্ষু উৎ- পাদন লক্ষ টন	তৈলবীজ উৎপাদন লক্ষ টন	পাট উৎ- পাদন লক্ষ বেল
উড়িষ্যা	১৯৬·৫	৬০·২	১৫০৮	২৯·৮	৪০·০	·০২	১·০	·৯	২·৬
অন্ধ্র প্রদেশ	৩১২·৬	১০৬·১	৪৮৩·৯	১২·২	৬৩·৯	১·২০	৬·৩	১০·৮	—
আঞ্চলিক মোট	৫০৯·১	১৬৬·৩	৬৩৪·৭	৪২·০	১০৩·৯	১·২২	৭·৩	১১·৭	২·৬

দক্ষিণ-অঞ্চল

রাজ্য	লোকসংখ্যা লক্ষ	আয়তন হাজার বর্গমাইল	মোট আবাদী জমি লক্ষ একর	জলসেচ জমি লক্ষ একর	খাদ্যশস্য উৎপাদন লক্ষ টন	তুলা উৎ- পাদন লক্ষবেল	ইক্ষু উৎ- পাদন লক্ষটন	তৈলবীজ উৎপাদন লক্ষ টন	পাট উৎ- পাদন লক্ষবেল
মাদ্রাজ	২৯৯·৭	·০·১	১৯৭·৭	৮·২	৫১·৭	৫	৪	১০·৫	—
মহীশূর	১৯৪·৭	৭৪·১	৮৬·৫	১০·৬	৩৮·৫	—	৪	৭·০	—
কেরালা	১৩৫·৫	১৫·০	৩৪·৪	৫·১	১০·৪	—	·০৪	·৩	—
আনুচলিক মোট	৬২৯·২	১১৯·২	৩১৮·৭	২৩·৯	১০০·৬	৫	৮·০৪	১৭·৮	—

মধ্য অঞ্চল

রাজ্য	লোকসংখ্যা লক্ষ	আয়তন হাজার বর্গমাইল	আবাদী জমি মোট লক্ষ একর	জলসেচ জমি লক্ষ একর	খাদ্যশস্য উৎপাদন লক্ষ টন	তুলা উৎ- পাদন লক্ষবেল	ইক্ষু উৎ- পাদন লক্ষটন	তৈলবীজ উৎপাদন লক্ষ টন	পাট উৎ- পাদন লক্ষবেল
মহারাষ্ট্র	৩২০·০	১১৮·৪	২৪৫	১৯·২	৬২·৭	১২·১	৮·৮	৭·২	—
মধ্য প্রদেশ	২৮০·৭	১৭১·২	১৭৯	১৪·৬	৯০·৭	৪·৭	১·৬	৫·৬	—
আনুচলিক মোট	৬৮০·৭	২৮৯·৭	৪৩৪	৩৪·৮	১৪৩·৪	১৭·৮	১০·৪	১২·৮	—

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল

রাজ্য	লোকসংখ্যা লক্ষ	আয়তন হাজার বর্গমাইল	আবাদী জমি মোট লক্ষ একর	জলসেচ জমি লক্ষ একর	খাদ্যশস্য উৎপাদন লক্ষ টন	তুলা উৎ- পাদন লক্ষবেল	ইক্ষু উৎ- পাদন লক্ষটন	তৈলবীজ উৎপাদন লক্ষ টন	পাট উৎ- পাদন লক্ষবেল
গুজরাট	১৬২·৬	৭২·১	১৭১·৪	২০·১	২১·২	১১·০	·৮	১০·৪	—
রাজস্থান	১৪৯·৭	১৩২·২	২৯২·৭	১৫·৩	৫০·৪	২·০	·১	২·৮	—
আনুচলিক মোট	৩২৭·৩	২০৪·৩	৪৬৩·৭	৩৬·৮	৭১·৬	১৩·০	১·৭	১৩·৩	—

দক্ষিণাপথের ও রাজস্থানের ভূ-আধিক অনুচলগুলিতে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব অনুচলটি খনিজ-সম্পদ-সম্বন্ধে পুষ্ট, অনুচলটিতে বৃহৎ শ্রমশিল্প স্থাপনের সুযোগ যথেষ্ট। বর্তমানে কয়েকটি বৃহৎ শ্রমশিল্প এই অনুচলে স্থাপিত হইয়াছে। দক্ষিণ অনুচলের আবাদী ফসল চা, কফি, রবার ও তামাকের আনুচলিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট রহিয়াছে। মধ্য অনুচলে কৃষি উন্নয়নের সাথে খনিজ সম্পদ উদ্ধার বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সাধিত হইলে অনুচলটির আর্থিক

অবস্থা উন্নততর হইবে। এই অঞ্চলের পশ্চিমভাগে, লাভা মিশ্রিত কালো মাটি, উন্নত পরিবহন এবং শ্রমশিল্প অঞ্চলটির ঐঅংশ এক নূতন রূপ দিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলটিতে রহিয়াছে দুইটি বিশেষ মৃত্তিকা—কার মিশ্রিত মৃত্তিকা ও লাভা মিশ্রিত মৃত্তিকা। উভয়ের পার্থক্য যথেষ্ট। জলসেচ, সাধারণ খনিজ সম্পদ ও বহন-শিল্প এই সকলবৎ অঞ্চলের বিশেষ আকর্ষণ।

ভারতে এই ছয়টি ভূ-আর্থিক অঞ্চলে সমগ্র ভারতের অনুপাতে কি সংখ্যক লোক বসবাস করে এবং কি পরিমাণ সম্পদ বিদ্যমান, উহা শতকরা হিসাবে নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হইল—

সমগ্র ভারতের অনুপাতে ভূ-আর্থিক অঞ্চল সমূহ (শতকরা)

অঞ্চল	লোকসংখ্যা	আয়তন	আবাদী জমি	জলসেচ জমি	খাদ্য-শস্য উৎপাদন	তূলা উৎ-পাদন	ইক্ষু উৎ-পাদন	তৈলবীজ উৎপাদন	পাট উৎ-পাদন
পূর্ব	২১·৫	১৫	১৫	২১	১৮	—	১২	২	৯১
পশ্চিম	২৩·৫	২১	২৪	২৫	২৪	২০	৫৪	২০	৫
দক্ষিণ-পূর্ব	১২·৭	১৪	২১	১৬	১৪	৩	৯	১৬	৭
দক্ষিণ	১৭·৪	১০	১০	১০	১৩	১১	১০	২৫	—
মধ্য	১৬·০	২৪	১৪	১৩	২১	৩৮	১৩	১৮	—
দক্ষিণ-পশ্চিম	৮·৯	১১	১৬	১৫	১০	২৮	২	১৯	—

লোক সংখ্যার অনুপাতে উপরি লিখিত ভূ-আর্থিক পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল তিনটিতে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বেশ কম। অঞ্চল তিনটিকে খাদ্য-শস্যে ঘাটতি অঞ্চল বলা চলে। দক্ষিণ-পূর্ব ও মধ্য অঞ্চল দুইটিতে খাদ্য-শস্য উদ্বৃত্ত থাকে। পশ্চিম অঞ্চলটি প্রয়োজনমত খাদ্যশস্য উৎপাদন করে। ইক্ষু উৎপাদনে ভারতের মধ্যে পশ্চিম অঞ্চলটির স্থান সর্বোচ্চ। অঞ্চলটি সর্বাপেক্ষা অধিক চিনি প্রস্তুত করে। অঞ্চলটির উচ্চ রাজস্ব নির্ভর করে ঐ সমস্ত সামগ্রীর উপর। সর্বাপেক্ষা কম ইক্ষু উৎপন্ন হয়—দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে তূলা উৎপন্নে মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল তিনটি অগ্রণী। পাট উৎপন্নে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে পূর্ব অঞ্চল এবং উহার পরই দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের স্থান। পূর্ব অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক পাট জাত সামগ্রী শিল্পজাত হইলে, বৈদেশিক অর্থ আহরনে সুবিধা হয়। ভূ-আর্থিক অঞ্চলগুলিতে লোক সংখ্যার অনুপাতে আঞ্চলিক সম্পদের যে সামাজ গরমিল রহিয়াছে, উহা সম-অনুপাতে নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টকর নহে।

অঞ্চলগুলির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হেতু আর্থিক উন্নয়নে তারতম্য হইবার একমাত্র কারণ। অনেক সময় অনুকূল অবস্থায় লোক সংখ্যার ঘনত্ব জটিল করিয়াছে।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আর্থিক কর্মসংস্থা

ভূ-আর্থিক অঞ্চল	বৈশিষ্ট্য	আর্থিক কর্মসংস্থা
পূর্ব	আবাদী ফসল—চা ও সিঙ্কোনা ; ভোগ্য ফসল—পাট, তামাক ও ইক্ষু ; খনিজ সম্পদ—কয়লা, খনিজ লৌহ, খনিজ তাম্র, বক্সাইট, অভ্র, চুণাপাথর ইত্যাদি ; উন্নত পরিবহন	সাধারণ ও আবাদী কৃষি খনিজ সম্পদ উত্তোলন ; শ্রমশিল্প—বৃহৎ ও মাঝারি ; কুটির শিল্প প্রায় সর্বপ্রকার ।
পশ্চিম	ভোগ্য ফসল—তামাক, তুলা ও ইক্ষু ; সামান্য খনিজ সম্পদ ; পরিবহণ-উন্নত	সাধারণ কৃষি ; মাঝারি শ্রমশিল্প—বয়ন শিল্প, চিনির কল, চর্ম শিল্প, কুটীর শিল্প, পশম শিল্প, কাঠের উপর কারু কার্য ও তৈজসপত্র নির্মাণ ।
দক্ষিণ-পূর্ব	সাধারণ কৃষি, খনিজ সম্পদ—কয়লা, খনিজ লৌহ, অভ্র	সাধারণ কৃষি, খনি খনন ও অল্প সংখ্যক শ্রমশিল্প, কুটীর শিল্প—তাঁত শিল্প ।
দক্ষিণ	আবাদী ফসল—নারিকেল, চা, কফি, তামাক ও রবার ; চন্দনবৃক্ষ ও মসলা ; খনিজ সম্পদ—খনিজ লৌহ, বক্সাইট, চুণাপাথর, অভ্র, স্বর্ণ	বিশেষ কৃষি ; খনি খনন ; শ্রমশিল্প—বৃহৎ ও মাঝারি । কুটীর শিল্প—তাঁত শিল্প ।
মধ্য	সাধারণ কৃষি ও শুষ্ক কৃষি ; তুলা ; খনিজ সম্পদ—কয়লা, খনিজ লৌহ, ম্যাঙ্গনিজ ও বক্সাইট	সাধারণ কৃষি ; খনি খনন ; পূর্ব ও পশ্চিম ভাগে শ্রমশিল্প—বৃহৎ ও মাঝারি ।
দক্ষিণ-পশ্চিম	ভোগ্য ফসল—তুলা ; খনিজ সম্পদ—খনিজ তাম্র ও লবণ	সাধারণ কৃষি ; শ্রমশিল্প—বয়ন শিল্প ; কুটীর শিল্প—তাঁতশিল্প তৈজসপত্র নির্মাণ ।

এক্ষণে এই ছয়টি ভূ-আর্থিক অঞ্চল শাসন ব্যবস্থায় কিরূপ কাজে আসিবে ? শাসন ব্যবস্থার নীতিগত উদ্দেশ্য হইল শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া আঞ্চলিক উন্নতি বিধান। আর্থিক উন্নতি বিধানে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করা আবশ্যক। উদ্যোগ বিধানে ও দৈনন্দিন শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন অধিবাসীদের বোধগম্য ভাষা। ভাবের আদান প্রদানে ভাষা হইল মাধ্যম। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইলেও আঞ্চলিক ভাষাকে উপেক্ষা

করা চলে না। আনুচলিক ভাষা অনুযায়ী দেশকে খণ্ড বিখণ্ড না করিয়া ভূ-আর্থিক অনুচলের প্রয়োজন ও গুরুত্ব বুঝিয়া শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন ভাষার প্রচলন থাকিতে পারে। প্রত্যেক অনুচলে মূল ভাষা কালে হিন্দী হইবে। শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য প্রত্যেক ভূ-আর্থিক অনুচলকে অবস্থান অনুযায়ী দিক দিয়া ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পূর্ব অঞ্চলটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। উহাকে পূর্ব পূর্বাঞ্চল, মধ্য পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিম পূর্বানুচলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পূর্ব পূর্বানুচলে আসাম, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অনুচল, নাগাভূমি, ত্রিপুরা ও মণিপুর থাকিবে। উন্নয়ন-পরিকল্পনায় ও স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় ভাষার প্রয়োগ থাকিবে। সমস্ত ভূ-আর্থিক অঞ্চলে শাসন-কার্যে রাষ্ট্র ভাষা হিন্দী ব্যবহৃত হইবে। উহাতে ভাষা লইয়া বিবাদের সুযোগ থাকিবে না। কালে ঐ পূর্বানুচলের তিনটি ভাগকে ক, খ, ও গ, নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। সমস্ত ভূ-আর্থিক অনুচলের অধিবাসীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আনুচলিক উন্নয়নে ব্রতী হইলে, গণতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে। সারা ভারতে সমস্ত ভূ-আর্থিক অনুচলগুলিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অধিবাসীরা একযোগে কার্যে ব্রতী হইলে, পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছান সহজ ও সরল হইবে। ভাষাভাষীর মাধ্যমে ছোট ছোট রাজ্য গঠনে কালক্ষেপন না করিয়া, ভূ-আর্থিক অনুচল নিখুঁতভাবে সীমায়িত করিয়া রাষ্ট্রের উন্নতি-বিধানে সকল ভারতবাসীকে ব্রতী হইতে হইবে। ভারতবাসীর সমবেত চেষ্টায় ভারতের মান পৃথিবীর বাজারে উচ্চস্থান অধিকার করিবে।—**জয়হিন্দ**।

মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(শিডিউল ব্যাঙ্ক)

কর্মদক্ষতা ও নিরাপত্তার সুনিশ্চয়তা প্রদান করে

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং সুযোগ প্রদান করে

জনসাধারণ এবং বিশেষ করিয়া ব্যাঙ্কের মক্কেলদের ব্যবসাগত অধিকতর সুযোগ-সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে আলিপুরদুয়ার অফিসটিকে ১৯৬৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে ব্যাঙ্কে উন্নীত করা হয়।

হেড অফিস :
৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

NATIONAL SHEET
Serves EVERY INDUSTRY

TIN PRINTERS AND
CONTAINERS MANUFACTURERS
INCLUDING
DRUMS KEGS BUCKETS Etc

PHONE: 55-4696 GRAM•NASMET WORK

NATIONAL SHEET & METAL WORKS
PRIVATE LIMITED.

36-A, SAHITYA PARISAD ST. ★ CALCUTTA-6

সরকারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে মূল্য ও মুনাফা-নীতি

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যের কথা আজ সর্বজনবিদিত। প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে শিল্পের ক্ষেত্রে যেখানে সরকারী প্রচেষ্টার আবেদন ছিল মাত্র শতকরা দু'ভাগ, আজ সেখানে সরকারী ভূমিকার ব্যাপ্তি শতকরা পঁচিশ ভাগ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নীতি আজ অর্থনীতির ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছে, সরকার আজ আর নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় বা নেপথ্যে নেই ; সরকার আজ নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

সরকারী কর্মপ্রচেষ্টার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যে চিন্তাটা আমাদের মনকে নাড়া দিচ্ছে সেটা হচ্ছে সরকারী উৎপাদনকেন্দ্রগুলির মূল্য ও মুনাফা নীতি সম্পর্কে। আমরা জানি যে সাধারণ ব্যবসার ক্ষেত্রে উৎপাদকের উদ্দেশ্য হল যথাসম্ভব বেশী পরিমাণ মুনাফা অর্জন করা ; এই উদ্দেশ্যে উৎপাদক তাঁর প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থের মধ্যে সমতা রক্ষার চেষ্টা করেন। বাজারে চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থা, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, ভোগোদ্যমের পরিমাণ, এই সব কিছুই উৎপাদকের মূল্য নীতিকে প্রভাবিত করে। কিন্তু সাধারণ উৎপাদকের সঙ্গে সরকারের বিরাট পার্থক্য ; সরকার শুধু উৎপাদকই নন, সরকার সমস্ত ক্রেতা স্বার্থের ধারকও বটে। তাছাড়া সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকে বড় করে দেখেছেন ; সুতরাং শুধু দ্রুত উন্নয়নের গতিই সরকারের একমাত্র লক্ষ্য নয়, কল্যাণকর উদ্দেশ্যগুলিও সরকারের মূলনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতার প্রয়োজনীয়তার কথাও আজ সুধীজন-স্বীকৃত। এই সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সরকারী প্রচেষ্টাগুলির মূল্য ও মুনাফানীতিকে যাচাই করতে হবে।

এক শ্রেণীর মতে কেবলমাত্র সফলই অস্তিত্বের অধিকারী ; যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগ মুনাফা অর্জন করছে, সে ক্ষেত্রে যদি সরকারী উদ্যোগের ক্ষতি হয়, মুনাফার পরিমাণ কম হয়, তবে তা সরকারী উদ্যোগের অক্ষমতার পরিচায়ক এবং সে অবস্থায় সরকারী কর্মপ্রচেষ্টার অস্তিত্বের কোন ন্যায্যতা নেই। এঁরা সরকারী প্রচেষ্টা ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য দেখছেন না, এবং এঁদের মত হল যে সরকারী প্রচেষ্টার মূল্যনীতিও মুনাফা অর্জনের ভিত্তিতে বা প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের নীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া উচিত। লার্নার, হোটেলিং প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ প্রান্তিক-ব্যয়ের নীতির সমর্থক।

বর্তমানে সরকারী নীতি হল যে সরকারী উৎপাদনকেন্দ্রগুলি মুনাফা অর্জনের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে, এই ক্ষেত্রে ক্লাসিকাল অর্থনীতির 'Normal price' শুধু মাত্র অর্জন করা হবে তা নয়, এই উৎস থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রের বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করতে হবে। বেসরকারী কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সেখানে কর দেওয়ার পরও বহু উদ্বৃত্ত থেকে যায় এবং সেই উদ্বৃত্ত ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নের জন্য পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়। বে-সরকারী উদ্বৃত্ত আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় : প্রথম ভাগ কর-বাবদ সরকারী তহবিলে যাচ্ছে ও দ্বিতীয় ভাগ ঐ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কল্পে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। সরকারী মত অনুযায়ী সরকারী উদ্যোগগুলিতেও একই অবস্থা সৃষ্টি না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না ; তাই সরকারী কর্মপ্রচেষ্টাগুলির মূল্য ও মুনাফা নীতি এমনভাবে নির্ধারিত হবে যাতে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ছাড়াও সাধারণ সরকারী তহবিলে দেওয়ার মতন উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই ভাবে ৪৪০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এই ধরণের মূল্য ও মুনাফা নীতি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করলে সরকারী আয় হয়ত কিছুটা বাড়বে, কিন্তু এই নীতি মূল্যস্তরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করবে তাতে কর্মসূচীগুলি কার্যকরী করার ব্যয়ও অনেক বেড়ে যাবে এবং মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা আরও প্রবল হবে।

সরকারী কর্ম প্রচেষ্টাগুলিকে আমরা কয়েকভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমতঃ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন। ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকে আমরা আবার দু'ভাগে ভাগ করতে পারি : অতি প্রয়োজনীয় ও সাধারণের ভোগ্য, এবং অনতিপ্রয়োজনীয় ও ধনীর ভোগ্য। প্রথম ক্ষেত্রে, যেমন Public utilities এর ক্ষেত্রে, সরকারকে private marginal product এর চেয়ে social marginal product এর ধারণার ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে ; এই ধরণের উৎপাদনগুলির প্রধানতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জনকল্যাণ বৃদ্ধি। রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থার কথা এই প্রসঙ্গে ধরা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি হলে হয়ত এই সংস্থা সাধারণ সরকারী তহবিলে কিছু যোগ করতে পারে; তার ফলে হয়ত সরকার দু' একটি নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন ; কিন্তু তার ফল সময় সাপেক্ষ, অনিশ্চিত ও পরোক্ষ। কিন্তু এই সংস্থার সেবার মূল্য যদি অল্প থাকে, তবে জনসাধারণ অল্পমূল্যে যাতায়াতের সুযোগে অনেকটা উপকৃত হবে, জনকল্যাণে রাষ্ট্রের ভূমিকা অনেকটা স্পষ্ট হবে। তবে একটা কথা, অনেক সময় এই সকল কল্যাণমূলক প্রচেষ্টার শাসনযন্ত্রের ত্রুটির জন্য অনেক উদ্বৃত্ত বা লোকসান হয়, সেই অক্ষমতা যেন জনসেবার উদ্দেশ্যের আড়ালে প্রচ্ছন্ন না থাকে।

ধনীভোগ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকার অধিক মুনাফা অর্জনের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন ; যেমন সরকার যে সমস্ত বিলাস-বহুল হোটেল খুলেছেন, সেগুলি থেকে সরকার যদি অনেক উদ্বৃত্ত অর্জন করেন, তবে তা সকল দিক থেকেই মঙ্গলজনক।

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদক দ্রব্য বা মূলধন ও অন্তর্বর্তী (intermediary) উৎপাদনের ক্ষেত্র। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির ব্যয় সংকোচের জন্য মূলধন দ্রব্যের মূল্য অল্প থাকাই বাঞ্ছনীয়। অন্তর্বর্তী দ্রব্যের ক্ষেত্রেও অল্প মূল্যের উপকরিতা অনেক—যেমন সার। সারের মূল্য বৃদ্ধি করে সরকার হয়ত সার উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে সাধারণ তহবিলের জন্য উদ্বৃত্ত আয় করতে পারেন, কিন্তু অল্প মূল্যে সার বিতরণ করা গেলে বর্ধিত কৃষিজ উৎপাদনের দিক থেকে বেশ বেশীই লাভবান হবে।

অবশ্য কয়েক ধরণের সরকারী প্রচেষ্টা আছে যে গুলিতে উৎপাদকদ্রব্য বা ভোগ্যদ্রব্য কোনটাই উৎপন্ন হয় না; যেমন জীবন বীমা কর্পোরেশন, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন, স্টেট ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। এই সমস্ত সংস্থা থেকে সরকার বেশ কিছু পরিমাণ উদ্বৃত্ত আয় করতে পারেন। বৈদেশমূলক মুদ্রানীতি সরকারকে মুনাফা অর্জনের বিষয়ে সাহায্য করতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন নীতির সামান্য পরিবর্তন কোন কোন সরকারী সংস্থার মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। যেমন, রেল বিভাগে 'ইন্টার' ক্লাসের পুনঃ প্রবর্তন নিঃসন্দেহে রেলের আয় বৃদ্ধি করবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় প্ল্যানিং কমিশন বলেছেন যে সরকারী কর্মপ্রচেষ্টা গুলির মূল্য-বৃদ্ধি যে মূল্যস্তর ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি করবে, একথা অনস্বীকার্য। এই স্বীকারোক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী উদ্যোগের মূল্য ও মুনাফানীতি সম্পর্কে আর একবার চিন্তা করা প্রয়োজন।

——:::০:::——

শ্রেষ্ঠ ও অধিক চা উৎপাদনের প্রয়োজনে
উৎকৃষ্ট সার অপরিহার্য
আমরা সর্বপ্রকার রাসায়নিক সার সরবরাহ করি
ঘোষাল ব্যানার্জী এণ্ড কোম্পানী
ভারত সরকারের মনোনীত চা-বাগানসমূহে সরবরাহকারী
২৩, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১
টেলিগ্রাম :—ব্লানফার্ট :: টেলিফোন—২২-৭৭৩৭

দুর্গোৎসব

দুর্গতি নাশিনী জগজ্জননী বরাভয় নিয়ে আসছেন বাঙালীর ঘরে। শরতের নির্মেঘ আকাশের নির্মল নীলিমায়, বাঁশের শুভ্র স্বচ্ছ হাসিতে, ভরা নদীর কলোচ্ছাসে, বিহগকুলের কাকলি কূজনে আনন্দময়ীর আগমনী ঘোষিত হচ্ছে। সমাসন্ন মাতৃপূজার পবিত্র লগ্নে বাঙালী পুনর্বার সমবেত হবে সখ্য প্রীতির স্নিগ্ধ বন্ধনে। জগন্মাতার কাছে সংগ্রামে বিজয় বর লাভের প্রার্থনায় মুখর হবে। দেশবাসীর সেই প্রার্থনার সঙ্গে আমরা আমাদের কণ্ঠস্বরও যুক্ত করি।

অজস্র দুঃখ সমস্যায় তীব্র তিক্ত বাঙালীর জীবন আবার মধুময় হয়ে উঠুক।

কে.মি.দাশ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা

আবিষ্কারক ঃঃ রসোমালাই

কৃষিপণ্যের বাজার প্রসঙ্গে

অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

ভারতের অনুন্নত অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতি-প্রয়াস আজ চলিতেছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে—যে পরিকল্পনা perspective framework বা ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। আশা করা যাইতেছে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে আমরা সেই অদীম সম্ভাবনাপূর্ণ take off stage বা উদ্ভিদনান অবস্থায় উন্নীত হইতে পারিব যখন হইতে আমাদের অর্থনীতি হইবে self-sustaining বা স্বয়ংচালিত, যখন প্রয়োজনীয় ও লক্ষ্য বিনিয়োগের হার, ভোগ্যপণ্য বা তার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী যন্ত্রাদি ও দক্ষতার হার, জনসংখ্যা ও জীবিকার্জনের সুযোগের হার এমন হইবে যাহাতে ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতশীল জয়যাত্রা অভ্যন্তরীণ কোন কারণে ব্যাহত হইবে না। প্রথম কারণ ভারতের মত অনুন্নত কৃষি-অর্থনীতির অগ্রগতির পরিকল্পনা কৃষির উন্নতির প্রচেষ্টা দিয়াই সুরু করা উচিত। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রতি এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় এই ঝোঁক বজায় রাখা হইয়াছে যদিও কৃষির উন্নতির দিকে মনোযোগ আরও আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় সত্যটি ভুলিলে চলিবেনা যে অনুন্নত অর্থনীতির যে কোন উন্নতি-প্রয়াসই নির্ভর করে কৃষিপণ্যের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত বা marketable surplus এর উপর, তা নিজের দেশের ভিতর হইতে সংগ্রহ করিয়াই হউক বা পি, এল-৪৮০ মারফতে ধার খয়রাতই হউক। যদি আমরা কৃষকদের নিজ প্রয়োজন ব্যতীত বিক্রয়যোগ্য কৃষিপণ্যের পরিমাণ বাড়াইতে না পারি তাহা হইলে প্রচ্ছন্ন বেকারীর অবসানও ঘটাইতে পারিবনা বা ঘাটতি ব্যয়জনিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিও সম্ভাব্য সীমায় রোধ করিতে সক্ষম হইবনা—ইহা শুধু উৎপাদনের উপরই নির্ভর করে না তাহার marketablily বা বিক্রয় পদ্ধতির উপরও নির্ভর করে। এই দিক হইতে ভারতীয় কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার আলোচনার গুরুত্ব সমধিক।

ভারতে বিক্রয় ব্যবস্থার প্রধান সমস্যাটি ফড়িয়া, ব্যাপারী, পাইকারী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি middlemen বা মধ্য-ভোগীদের অবাধ কার্যকলাপ হইতে উদ্ভূত। খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি দেখাইয়াছে যে শতকরা ৫০ ভাগেরও কম কৃষিপণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজারজাত হইবার সুযোগ পায় এবং প্রকৃত দামের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী অংশ এই মধ্যভোগী শ্রেণীর করায়ত্ত হয়। কিভাবে এই শ্রেণীর কারচুপিতে প্রকৃত উৎপাদক ও শেষ-ক্রেতা জনসাধারণের মধ্যে দুয়ের আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়, কলিকাতার মাছের বাজারের সাম্প্রতিক 'আগুন লাগা দর' হইতেই আমরা দেখিয়াছি। তাই খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅতুল্য প্রসাদ সেন, শ্রীএ, ডি, গোরওয়ালা প্রভৃতি এই

শ্রেণীর কার্যকলাপের সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন সম্পর্কে একমত। কারণ ইহাদের জন্য কৃষকরা ফসল উঠার পরই যখন দাম এমনই কমে থাকে তখন গ্রামেই সস্তাদরে অধিকাংশ কৃষিপণ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। হিসাবে প্রকাশ, যে শতকরা ৬৫ ভাগ বিক্রয়কারী কৃষিপণ্য বাজারের পথে না যাইয়া গ্রামেই বিক্রিত হয়। গ্রামের মহাজন শুধু সুদের বেড়াজালেই কৃষককে বংশপরম্পরায় জড়ায় নাই, আবার ব্যবসায়ী সাজিয়া অধিকাংশ পণ্যই সুদ আসল ও কৃষকদের শস্য ধরিয়া রাখিবার অক্ষমতা হেতু সস্তাদরে সংগ্রহ করিয়া পাইকারী বাজারে চড়া দরে বিক্রয় করে। কিন্তু সমস্যার শুধু এখানেই শেষ নয়। বিরাট দেশের ১৮০০ পাইকারী ২৩০০ শত অনিয়ন্ত্রিত বাজারে অজস্র রকমে ওজনের মাপকাঠি ও কারচুপি, জিনিসের ব্যাপক ভাগত তারতম্য ইত্যাদিও কৃষকদের সরাসরি পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ—যাহা বর্তমানে মেট্রিক ওজন ও 'আগমার্ক' এর ছাপ দিয়া দূর করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। সমস্যার ব্যাপকতার তুলনায় যাহা যথেষ্ট নয়। তারপর শস্য মজুদ করিবার এমন কোন ব্যবস্থা নাই যাহার বিনিময়ে কৃষকরা আগাম পাইতে পারে, গ্রাম হইতে বাজারে যাইবার রাস্তাঘাট পর্যন্ত নাই, বাজারের প্রকৃত দর সম্পর্কে কৃষকদের কোন ধারণা নাই, আর মুষ্টিমেয় যে কয়জন ক্রেতা বাজারে উপস্থিত হয় তাহারাও একদল অসাধু পাইকারী ব্যবসায়ীর কবলে পড়িয়া অনেক সস্তা দরে শস্য বিক্রয় করিয়া চড়াদরে কাপড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস কিনিয়া বাড়ী ফিরিতে বাধ্য হয়।

এই অসম অবস্থার যে আশু অবসান প্রয়োজন সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। তার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন ফড়িয়াদের হাত হইতে কৃষকদের রক্ষা করিবার জন্য বাজার regulate বা নিয়ন্ত্রণ করা, যাহার প্রধান উদ্দেশ্যই হইবে উৎপাদককে তাহার পণ্যের জন্য ন্যায্যমূল্য পাইবার ও গ্রাম হইতে বাজারে বিক্রয়গামী পণ্যের যাতায়াত সুগম ও ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা করা। এজন্য Directorate of Marketing and Inspection এর কাজের অনেক প্রসার করিতে হইবে এবং 'আগমার্কের' আওতায় আরও অনেক বেশী কৃষিপণ্য আনিতে হইবে। সারা দেশের মধ্যে units of quotations, market charges ইত্যাদির মধ্যে সমতা আনিতে হইবে এবং duality controlএর উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে। Market Intelligence Serviceকে আরও জোরদার করিতে হইবে। পাইকারী বাজারগুলিতে কৃষিপণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিক বাজার সমিতি স্থাপন করিতে হইবে এবং মূল্যানুযায়ী (ad valorem) বাজার সেস্ (cess) বসাইয়া ইহাদের ব্যয় ভারের কিছুটা সুরাহা করা যাইতে পারে। কৃষিপণ্যের চলাচল ব্যবস্থা সুগম করা ও গুদাম ইত্যাদির ব্যবস্থার প্রসার অত্যাবশ্যক—যেখানে পণ্য জমা দিয়া কৃষকরা প্রয়োজনীয় ঋণ পাইতে পারিবে। কিন্তু কৃষকদের ঋণের সমস্যার সমাধানই আসল প্রশ্ন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংগঠিত সারা ভারত গ্রাম্য ঋণদান সার্ভেও দেখাইয়াছে যে কৃষি-পণ্যের বাজার সমস্যা ও কৃষকদের ঋণের সমস্যা আলাদাভাবে বিচার করা উচিত হইবেনা।

কারণ, সেই ঋণের জন্য কৃষককে যদি গ্রামের মহাজনের নিকটই হাত পাতিতে হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট সস্তায় পণ্য বিক্রয় করিতেও বাধ্য হইবে। একটি সুসংবদ্ধ (Integrated Scheme) পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানের নির্দেশ এই সার্ভে দিয়াছে। ইহাতে বাজার সমবায় সংস্থা ও ঋণদান সমবায় সংস্থা পাশাপাশি গড়িয়া উঠিবে এবং কৃষকদের ঋণ দিবার একটি সর্তই হইবে যে তাহাদের পণ্য বাজার সংস্থার মাধ্যমে বিক্রয় করিতে হইবে, যাহার জন্য অবশ্যই তাহারা ন্যায্য মূল্য পাইবে। সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত FAO-ECAFE মিলিত সম্মেলনেও ইহা আলোচিত হইয়াছে যে গ্রামীন স্তরে (Farm level) কৃষকদের কৃষিপণ্য লইয়া প্রতিযোগিতার অভাবই কৃষিপণ্যের বাজারের সমস্যাটিকে ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে এবং ইহা দূর করিতে চইলে কৃষকদের মহাজনের নিকট ঋণের জন্য পণ্য বিক্রয় করার বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। আসলে কৃষিপণ্য সংক্রান্ত সকল সমস্যাকে একত্র করিয়া দেখিতে হইবে এবং বিচ্ছিন্নভাবে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা না করিয়া সারা দেশ জুড়িয়া একটি coordinated বা যৌথ পরিকল্পনার মাধ্যমে ইহার সমাধান করিতে হইবে।

এ অবস্থায় কৃষিপণ্যের বাজার প্রসঙ্গে আমাদের পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলি বিচার করা যাক। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যদিও কৃষির উন্নতির জন্য উদারহস্তে খরচ করা হইয়াছে তথাপি কৃষিপণ্যের বাজারজনিত সমস্যাকে সেরূপ আমল দেওয়া হয় নাই—যদিও কিছু কিছু রাস্তাঘাট হইয়াছে, প্রায় ৪৫০টি বাজার নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে ও কয়েকটি গুদাম তৈয়ারী হইয়াছে। আর স্থাপিত হইয়াছে Forward Market Commission যা আগাম বাজার সংস্থা যাহা আগাম দাদন ইত্যাদিনিয়ন্ত্রণ করিবে, যাহাতে ফাটকাবাজি হ্রাস পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথম পরিকল্পনার চাইতে এদিকে অনেক বেশী নজর দেওয়া হইয়াছে এবং স্থির হইয়াছে আরও ৪০০টি বাজার দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হইল যে, স্থির হইয়াছে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষিপণ্যের বাজার সমস্যাকে সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে সমাধান করিতে হইবে এবং তাহার জন্য ১০০০টি সমবায় বাজার সমিতি স্থাপন করা হইবে, যাহার পাশাপাশি গ্রাম্য ঋণদান সমবায় সমিতিগুলিও স্থাপন করা হইবে। আশা করা হইয়াছে যে বিক্রয়াকর্মী পণ্যের শতকরা ১০ ভাগ এই সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে বিক্রয় করা হইবে এবং বাকী অংশ নিয়ন্ত্রিত পাইকারী বাজারের মাধ্যমে বিক্রয় হইবে। পণ্য সংরক্ষণের উপর অনেক জোর দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য Warehousing Corporations স্থাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৩৫০টি গুদাম তৈয়ারী করা হইবে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রিপোর্টে যে সংক্ষিপ্তভাবে Agricultural Marketing লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে আমরা কিছুটা নিরাশ হইয়াছি। মোট ৭৭৩টি

পৃষ্ঠার বিশাল গ্রন্থের মধ্যে প্রকৃত কৃষিপণ্যের বাজার লইয়া আলোচনা হইয়াছে মাত্র ১৫ লাইনে এবং আনুষঙ্গিক সব মিলিয়া দুই পৃষ্ঠার মধ্যে আলোচনা সমাপ্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার কার্যবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, সারা ভারতের ২৫০০টি বাজারের মধ্যে ৭২৫টি বাজার নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে এবং বাকী অংশকে তৃতীয় যোজনাকালে নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। কৃষিপণ্যের আইনকে (Agricultural Produce Grading and Marketing) আরও সম্প্রসারিত করা হইবে। বাজার সংক্রান্ত সংবাদ বিতরণের ব্যবস্থাকে উন্নত করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে ১৮৬৯টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি স্থাপন করা হইয়াছে এবং তৃতীয় যোজনাকালে আরও ৬০০টি বাজার স্থাপন করা হইবে। এই সমবায় বাজার সমিতিগুলি কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিতরণের ভারও গ্রহণ করিবে। প্রায় ২০০ কোটি টাকার কৃষি সংক্রান্ত ব্যবসা এই বাজার সমিতি-গুলি গ্রহণ করিয়াছে যাহা তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বাড়িয়া প্রায় ৪০০ কোটি টাকার মত হইবে আশা করা হইয়াছে। গুদাম তৈয়ারীর উপরও জোর দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১৬৭০ টি গুদামও তৈয়ারী করা হইয়াছে। গ্রামে ৪১০০ টি গুদাম তৈয়ারী করা হইয়াছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যথাক্রমে ১০০টী ও ২২০০টি শস্য গুদাম স্থাপন করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। কোনরূপ তত্ত্বমূলক বা analytical আলোচনা নাই, অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের সহিত ইহার নিবিড় সম্পর্কের আলোচনা নাই, নিতান্ত দায়সারা ভাবে একটি কর্মসূচীর বিবরণ মাত্র দেওয়া হইয়াছে।

আসলে primary producing countries বা কৃষি উৎপাদক দেশগুলির সাথে এ বিষয়ে ভারতের ভাগ্য জড়িত যাহা একক প্রচেষ্টার দ্বারা দূরীভূত হইবার নহে; FAO ইত্যাদি সংগঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার দ্বারাই ইহা রোধ করা সম্ভব। আর যে সকল কৃষিপণ্য আভ্যন্তরীণ বাজারের উপর নির্ভরশীল তাহাদের জন্য চাই একটী সুনির্দিষ্ট মূল্য-নীতি এবং price support programme, নতুবা কৃষকদের আয়ের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হইবেনা। তাই বলিয়া আমরা বলিনা যে দাম একটি নির্দিষ্ট অঙ্কেই স্থির থাকিবে। তবে ইহা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে উঠানামা করিবে। দামের স্থিতির ব্যাপারে buffer stock mechanism বা মজুত শস্য ভাণ্ডার গঠন করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যায় এবং এবিষয়ে সরকার নাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে পি,এল, ৪৮০ আইনে যে খাদ্যশস্য আনিয়া শস্য ভাণ্ডার স্থাপনের পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে ইহার সুফল যে মূল্যস্থিতিতে সাহায্য করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার কার্যাবলীর প্রসার করিয়া অন্যান্য প্রধান প্রধান কৃষিপণ্যের অন্তর্ভুক্তিও প্রয়োজন, ফলে, পাট শিল্পের ক্ষেত্রের সাম্প্রতিক সংকটের ন্যায় ঘটনাও অনেকাংশে দূর করা যাইবে। কিন্তু দামের স্থিতি ব্যতিরেকেও আমরা যদি কৃষিপণ্যের বাজার হইতে ফড়িয়া ব্যাপারীদের উচ্ছেদ করিতে চাই, তাহা হইলে কৃষি-

পণ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসার উদ্যোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই, যাহা বর্তমান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীএস, কে, পাতিল চান না। কিন্তু পণ্যের দাম বাঁধিয়া দেওয়া আর মজুতদারদের উচ্ছেদ করা এক কথা নয় এবং আমরা যদি ইহাকে ধীরে ধীরে ব্যাপক ভাবে পরিচালিত করিতে চাই তাহা হইলে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা, সমবায় আন্দোলন ইত্যাদির সহিত কুটিরশিল্পের ব্যবসার সমাজীকরণও করিতে হইবে।

—o—

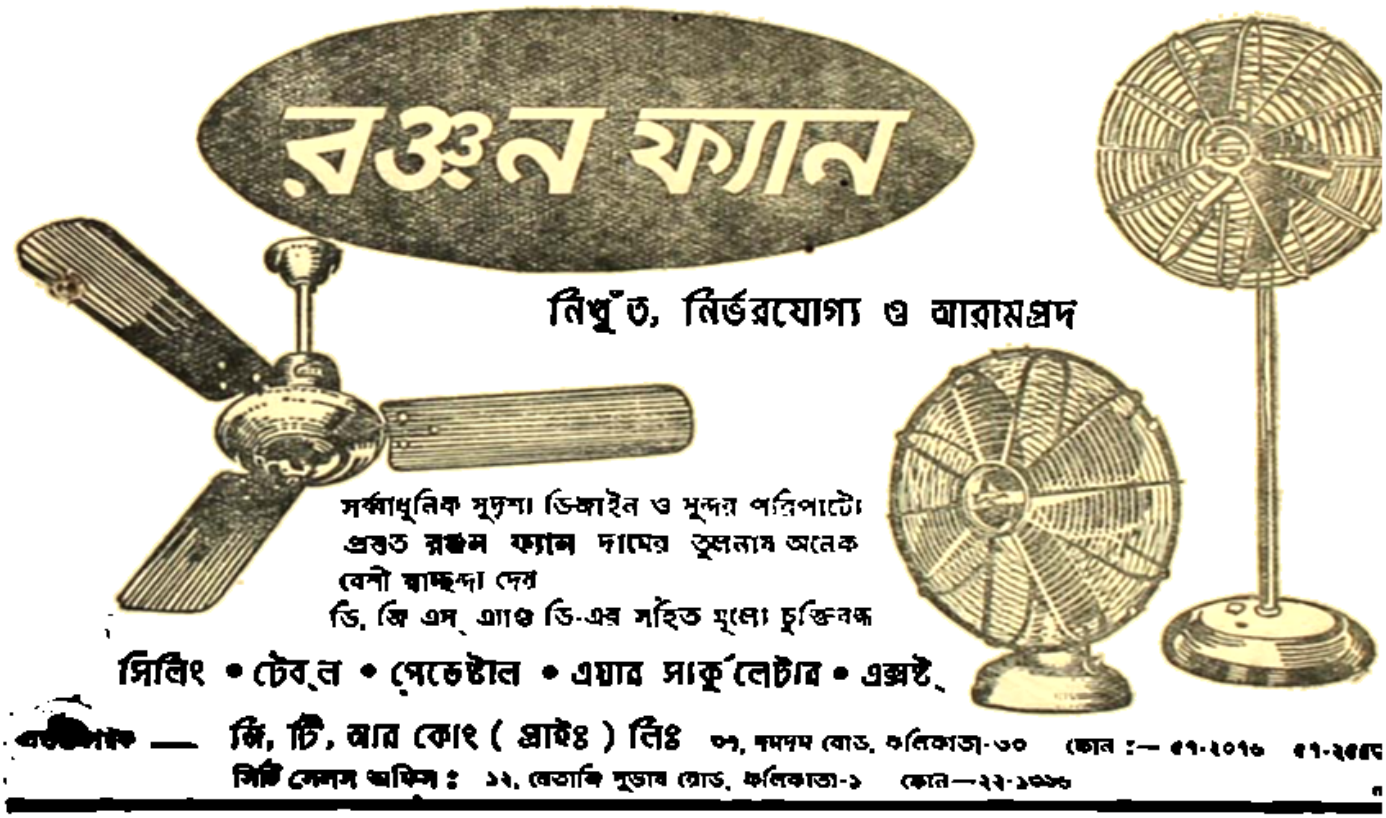

শারদীয় শুভেচ্ছা
পূর্ব রেলওয়ে

আর্থিক মূল্যায়ন ও ভারতীয় অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীঅমরনাথ দত্ত

বিগত দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়ে যাবার পর সম্প্রতি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল আমাদের দেশে সুরু হয়েছে। এই দুটি পরিকল্পনায় বিশেষ করে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আমাদের বৈষয়িক উন্নতির শারিব্যাপ্তি-প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ঘটবে। মূলধন উৎপাদন, শিল্পে অগ্রগতি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পুনর্বিন্যাস, কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ, সামাজিক ও কল্যাণমূলক কর্মসূচীর তুলনামূলক অগ্রগতি যথেষ্ট আশা ও অসীম অনুপ্রেরণার সঞ্চয় করেছে।

আপাতভাবে পরিকল্পনা বলতে কতকগুলি বৈষয়িক ও আর্থিক কর্মধারার নির্দিষ্ট সূচী প্রবর্তন করাই আমরা প্রধান লক্ষ্য বলে ধরে নেই, কিন্তু বিভিন্ন দেশে ঐ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কিছু অদলবদল করা হয় সামাজিক প্রয়োজনের আপেক্ষিক গুরুত্বের তারতম্যে ও জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ সাধনের পরিপ্রেক্ষিতে। এজন্য প্রত্যেক দেশেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার নির্দিষ্ট কতকগুলি কর্মসূচী বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র অর্থনীতিতে অসীম আত্মনির্ভরতার একটা বলিষ্ঠ ভাব এনে দেওয়া, যাতে করে তা কৃষি, শিল্প, কর্মনিয়োগ ও সমাজসেবার সকল স্তরেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। সেই আত্মনির্ভরতার মাত্রা আমাদের দেশে কতখানি এসেছে তার একমাত্র পরিমাপ শুধু মূল্যনীতির দ্বারাই সম্ভবপর। অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার প্রত্যেক স্তরেই, যেমন, উৎপাদন পদ্ধতি থেকে সুরু করে বিনিয়োগনীতির মাধ্যমে ভোগ-ব্যবস্থা পর্যন্ত সামগ্রিক কর্মসূচী পারস্পরিক দ্রব্য সমূহের মূল্যস্তরের তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতেই গৃহীত হয়ে থাকে এবং তার মধ্যে দিয়ে জাতীয় আয়ের বণ্টনও অপরিমাণভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। ক্রেতাদের চাহিদা ও বিক্রেতাদের উৎপাদনব্যয়ের হিসাবও এর মধ্যে পড়তে থাকে। এতে করে অনবরতই পেশাগত বিভাগ ও শিল্পের মধ্যে প্রাক্তিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কাজেই সাধারণ মূল্যস্তর ও বিশেষ পণ্যসামগ্রীর মূল্যসূচী শুধু বর্তমানেই অর্থনৈতিক উপাদানগুলির বিভাজন, গতিশীলতা ও শিল্পগত নির্দেশীকরণ ঠিক করেনা; ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক প্রগতি কি রূপ নেবে বা কোন ধারায় তা অগ্রসর হবে তা সবই এতে করে ধরা যায়—যেমন নিশ্চয় করে বোঝা যায় কতখানি সম্পদের যথাযথ ব্যবহার অথবা অপচয় ঘটছে। আবার এও বোঝা যায় দেশের মধ্যে সঞ্চয়, মূলধন সংগঠন ও বিনিয়োগের উপর এর অসীম প্রভাব কতখানি এবং তারা কি ভাবে কার্যকরী হচ্ছে। মূল্যস্তরের গতির মধ্যে দিয়ে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে বিশেষ পথে পরিচালনা করা

যেতে পারে ও বিভিন্ন সময়ে সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ কতকগুলি লক্ষ্য সাধনে তাকে নিয়োগ করা যেতে পারে। তাই পরিকল্পনার মধ্যে অর্থীয় শক্তি সম্পর্ক কার্যপদ্ধতির, অর্থাৎ মূল্যস্তরবিধি ও মূল্যনীতির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকা এসমস্ত কারণে আবশ্যিক।

এই প্রসঙ্গেই আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিনিয়োগ ব্যবস্থায় বিভিন্ন বস্তু-সামগ্রীর মূল্য স্থির করা হয় আপাতভাবে তাদের চাহিদা ও সরবরাহের দ্বারা। আরও বিস্তৃত করে বলা যেতে পারে যে প্রকৃত বিনিময়মূল্য (Real Exchange Value) বস্তুনিচয়ের চাহিদা ও সরবরাহের উপর নির্ভর করলেও দাম বা মূল্য (price) নির্ভর করবে বস্তু ও অর্থের পারস্পরিক চাহিদা ও সরবরাহের উপরে। আর অর্থ এবং অন্যান্য বস্তুর এই পারস্পরিক সম্পর্ক পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে দেশের কার্যকরী চাহিদার (effective demand) উপরে অর্থাৎ দেশের মধ্যে কতখানি ক্রয়শক্তি বিদ্যমান, আর দেশবাসী তাকে কিভাবে, কোনদিকে এবং প্রত্যেকবারে কি পরিমাণে ব্যবহার করবে। এই সম্পর্ক থেকেই স্থির করা হবে বিভিন্ন উপাদানকে কত করে আর্থিক মজুরি দেওয়া হবে; দেশের অর্থের প্রয়োজনের মধ্যে দিয়ে মূল্যসূচী এই ভাবেই আর্থিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তিভূত হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সকলেই এটা ধরে নিতে পারেন যে মূল্যস্তরের সঞ্চালন ও গতি-বিধি দেশের অর্থনীতির পক্ষে কতখানি অসীম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষ করে এই কারণে যে যদি বস্তু-সামগ্রীর অথবা বিভিন্ন পেশার মধ্যে মূল্যস্তরের অসম গতি পরি-লক্ষিত হয় তাহলে তা সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে গভীর ভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলতে পারে।

সাম্প্রতিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অর্থনীতিকে স্বয়ংক্রিয় শক্তির সাহায্যে চালনা করা (Self-sustaining growth)। আর তা একমাত্র সম্ভব যদি জাতীয় অর্থনীতিতে আয়ের পরিমাণ ক্রমশঃই বেড়ে যেতে থাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে যে অর্থনীতির প্রত্যেকটি স্তরেই সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য করা হচ্ছে কিনা। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন ইত্যাদি প্রত্যেটি অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। অবশ্য ইহা ঠিক যে উৎপাদনব্যবস্থা ও তার সাফল্য অনেকাংশে শিল্প কৌশলের (technical consideration) উপর নির্ভর করে। কিন্তু উৎপাদন কতখানি বাড়ল তা একমাত্র মূল্যনীতির মধ্যে দিয়েই জানা সম্ভব। তার কারণ এই যে দামের সাহায্যেই আমরা প্রত্যেক স্তরে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের (input and output) মধ্যে সংযোগ ও সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারি।

একটি উন্নত অর্থনীতির প্রধান ভিত্তিভূত হচ্ছে বিনিয়োগ ও সঞ্চয় ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রত্যেক পর্যায়ে এই দুটির মধ্যে ক্রমসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হতে দেখা যাবে। যদি তা না হয়ে দুটির মধ্যে পার্থক্য দেখা দিতে থাকে তা ক্রমশঃই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। তাতে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসঙ্কোচন দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায়

তাই ঘটে এসেছে এবং সেজন্যেই ভারতীয় অর্থনীতি তীব্র সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে কাল পরিক্রমা করছে। হিসেবে দেখা গেছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষের দিকে বিনিয়োগ ঘটবে জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগ। আর সেখানে সঞ্চয় হবে জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ; সুতরাং বিনিয়োগ বাড়াতে গেলে সর্বপ্রথমে চাই উন্নত সঞ্চয় ব্যবস্থা। এর সঙ্গে আবার উৎপাদন বৃদ্ধির যোগাযোগ অত্যন্ত গভীর। ভোগ সঙ্কোচন করে হয়ত সঞ্চয় বাড়ান যেতে পারে, কিন্তু আজ আকাশস্পর্শী মূল্যস্তরের পটভূমিকায় সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই অবান্তর।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শতকরা ৩০ ভাগ জাতীয় আয় ও শতকরা ১৭ ভাগ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির আশা করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের দামের ভিত্তিতে জাতীয় আয় ১৪,৫০০ কোটি টাকা থেকে ১৯,০০০ কোটি টাকায় আর মাথাপিছু আয় ৩৩০ টাকা থেকে ৩৮৫ টাকায় এসে দাঁড়াবে, এই রকম অনুমান করা হয়েছে। জাতীয় আয়ের এই পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটানোর জন্যে নীট বিনিয়োগের হারকে বর্তমান (১৯৬০-৬১) শতকরা ১১ থেকে শতকরা ১৪-১৫ তে নিয়ে যেতে হবে। আর এর জন্যে জাতীয় আয়ের অনুপাতে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হারকে শতকরা ৮·৫ থেকে শতকরা ১১·৫ এ এবং কর-প্রদানের অনুপাতকে শতকরা ৮·৯ থেকে শতকরা ১১·৪ এ নিয়ে যেতে হবে; ফলে, এই পরিকল্পনায় বিনিয়োগের কিছুটা অংশ বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা সংঘটিত হলেও ভোগের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাবে না। বস্তুতঃ পরিকল্পনায় বিনিয়োগের প্রয়োজনে ভোগকে যে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে তা বারবার বলা হয়েছে।

আমাদের দেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রসার কতদূর? এই প্রশ্নের উত্তর নানাভাবে দেওয়া যেতে পারে। এখানে আমরা শুধু মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি দিয়েই তা আলোচনা করার চেষ্টা করব। পরিকল্পনা কমিশন সুস্পষ্টভাবে স্বীকার না করলেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধে অক্ষমতা হ'ল দ্বিতীয় পরিকল্পনার অসাফল্যের আর একটি দিক। সন্দেহ নেই, সমগ্র প্রথম পরিকল্পনাধীন সময়ে দ্রব্যমূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরু থেকেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাইকারী সূচকসংখ্যা পরিকল্পনার পাঁচ বছরে শতকরা ৩০ ভাগ বেড়ে যায় আর শ্রমিকদের জীবনযাত্রার সূচকসংখ্যা বেড়ে যায় শতকরা ২৫ ভাগ। সামগ্রিক মূল্যের সূচকে খাদ্যমূল্যের অংশ শতকরা ৫০ ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই খাদ্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ২০ ভাগ। অন্যান্যদ্রব্যের ত কথাই নেই। প্রায় ক্ষেত্রেই বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে অর্থের পরিমাণ বেড়ে যাবার জন্যেই মূল্যস্তরও বেড়ে গেছে। অবশ্য খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে চললেও তা বিপজ্জনক অবস্থায় আসেনি এই কারণে যে সরকার বিদেশ থেকে কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করেছেন ও পি, এল, ৪৮০ অনুযায়ী খাদ্যের দাম মেটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তবুও এটা বোঝা যাচ্ছে না যে খাদ্য ও বস্ত্রের

উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কোন তাদের দাম কিছুতেই কমছে না। যতদূর ধারণা করা যেতে পারে যে, এই কারণের জন্য মজুতবৃদ্ধি ও সরকারের উদাসীন নীতিই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতার পরিচায়ক।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অনুন্নত দেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ হচ্ছে সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি। যদিও অবশ্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যেকার পার্থক্য-টুকু বৈদেশিক মূলধন দিয়ে পূরণ করা যেতে পারে তবুও বেশী দিন ধরে বিদেশীরা স্ফীত অর্থ ব্যবস্থায় বিনিয়োগে করতে উৎসাহিত বোধ করে না। আবার অন্যদিকে বৈদেশিক সম্পদ যত বেশী পরিমাণে খরচ করা হবে তত বেশী ক্রয় ব্যবস্থার উপর চাপ পড়বে, দাম ক্রমশই বেড়ে চলবে। দ্বিতীয়তঃ রপ্তানি দ্রব্যের দাম যদি ক্রমাগতই বেড়ে চলে তাহলে তাতে বিদেশের মধ্যে বাড়তি ক্রয় ক্ষমতা সৃষ্টি হবে এবং তা মূল্য বৃদ্ধির চাপ ঘটাবে। তৃতীয় অনুন্নত দেশে চাহিদা ও সরবরাহের প্রকৃতি আলোচনা করলেও কিছু বৈশিষ্ট্য তাতে লক্ষ্য করা যায়। ভোগপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে তার উৎপাদক ক্ষুদ্র সমবেশ মধ্যে বাড়িয়ে তোলা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, তাতে মূল্য বৃদ্ধির চাপ বেড়ে যায়। শুধু কৌশলগত বাধা নয়, যোগাযোগ, পরিবহন ও অন্যান্য বন্টনগত বাধা এর জন্য অনেকাংশে দায়ী।

একটু আগেই যে হিসেব দেখানো হয়েছে, তাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে। সাধারণ হিসেব অনুযায়ী তা বছরে ৬ ভাগেরও বেশী মূল্য বৃদ্ধির সূচনা করে। দশ বছরের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগের কাছা-কাছি মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। এতে করে প্রত্যেক স্তরেই মূল্য বৃদ্ধি ঘটতে থাকে আর সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে নিদারুণ বৈষম্য দেখা দেয়। প্রশ্ন উঠতে পারে কন্ট্রোল ব্যবস্থা চালু করে যদি জিনিষপত্রের দাম বেঁধে দেওয়া যায় তাহলে কি হবে? কিন্তু এক্ষেত্রে তাতে কোন সুবিধা হবে না। আপাতভাবে তাতে হয়ত মুদ্রাস্ফীতি চেপে দেওয়া হবে কিন্তু মূল অব্যবস্থা ঠিক থাকবে। কন্ট্রোল তুলে নিলেই তা ভয়াবহ আকারে দেখা দিবে এবং দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে এলোমেলো করে দেবে। আমরা মূল্যনিয়ন্ত্রণ করে কোন সুরাহাই করতে পারবনা।

এই প্রসঙ্গে অবিশ্যি একথা মনে করা যুক্তিসঙ্গত হবে না যে সব ক্ষেত্রেই সরবরাহের উপর বাড়তি চাহিদার চাপ পড়লেই ইনফ্লেশন হবে। এখানে এই প্রসঙ্গে মূল্য-মজুরি-চক্রের (wage-price spiral) কথা উল্লেখ করা হতে পারে। যেখানে দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বিশেষভাবে উৎপাদন ব্যয়ের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়ে থাকে, যেখানে মূল্য এবং মজুরী উভয়েই উৎপাদন ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল, সেখানে মূল্য-মজুরী-চক্র ঘটিত প্রকৃত ইনফ্লেশনের গতি বেগ নির্ভর করে দুটি কার্যকালের সময়গত ব্যবধানের উপর। আরও পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে এর মধ্যে একটি হল উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে দ্রব্য মূল্যের সামঞ্জস্য বিধানের

ব্যবধান (lag in adjustment), অপরটি হল জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে মজুরীর হারের সামঞ্জস্য সংবিধানের ব্যবধান। এই ব্যবধানগুলি যতই দীর্ঘতর হবে মূল্য মজুরী বৃদ্ধির হার ততই মন্থর হবে এবং নতুন ভারসাম্যের অবস্থায় (যদি এরকম কিছু থেকে থাকে) পৌঁছতে কিছুটা সময় লেগে। সুতরাং যেখানে মজুরী উৎপাদন ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল এবং দ্রব্যমূল্য খুবই বিতিস্থাপক যেখানে মূল্যবৃদ্ধির হার নির্ভর করবে অর্থযোগ বৃদ্ধির পরিমাণগত হারের উপর এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণগত পরিবর্তনের উপর। ইনফ্লেশন বৃদ্ধির হার কিয়দংশে নির্ভর করবে দেশের প্রভাবশালী শক্তি গোষ্ঠির উপর (active power groups)। সুতরাং তারা যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব হ্রাস করবার জন্য তাদের আয়, ব্যয় ও সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ব্যবহার করতে লাগেই হয়, তবে দেশে যদি স্থির আয় ভোগকারীর (fixed income groups) অনুপাত অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে, তাহলে অবশ্য ইনফ্লেশনের গতিবেগ কমে আসে। কারণ তারা (যেমন, মাসিক মাইনে ভোগকারীগণ খাজনা ভোগকারীগণ) যে দ্রব্য ক্রয় করে তার দাম বাড়াতে চাইবেনা।

সবচাইতে আশ্চর্যের কথা এই যে ইনফ্লেশনের চরম অবাবস্থার কথা জেনেও অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, অর্থনৈতিক উন্নতির পথে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি অপরিহার্য। ওঁদের যুক্তি হচ্ছে যে ইনফ্লেশনের সময়ে ব্যবসায়ীরা বেশী করে মুনাফা লাভ করেন তাতে ব্যবসার উন্নতি ঘটতে থাকে বলে আরও বেশী করে টাকা বিনিয়োগ করতে তারা উৎসাহিত হন। ফলে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে অর্থ অত্যন্ত সচল হয়ে পড়ে এবং তাতে করে উৎপাদনের সকল উপাদানগুলি গতিশীল হয়ে উঠে। সুতরাং ব্যবসায়ীরা অধিকতর পদ্ধতি হারে মুনাফাগত বাড়তি সঞ্চয়ের সাহায্যে উচ্চতর বিনিয়োগ ব্যবস্থার অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। এই অনুসিদ্ধান্তের একমাত্র ভিত্তি হল মুনাফাভোগী ও মজুরীভোগী ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রান্তিক ইচ্ছার পার্থক্য (differential marginal propensities)। মুনাফা ও মজুরীর মধ্যে প্রান্তিক সঞ্চয় ইচ্ছার পার্থক্য অনুন্নত দেশগুলিতে অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক; একদিকে মুনাফার পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে অন্যদিকে মজুরীর পরিমাণ সাধারণভাবেই এত অল্প হয়, যাতে মজুরিভোগকারীগণ তাদের প্রায় সবটাই আয়ের সবটাই খরচ করে ভোগের উপরে। আর এদিকে যেহেতু স্থির আয় ভোগকারী ব্যক্তিদের সংখ্যা অত্যন্ত কম, যেজন্য অনুন্নত দেশে মূল্য বৃদ্ধির সাহায্যে অর্থনৈতিক সম্পদ যে পরিমাণে হস্তান্তরিত করা যাবে তা অত্যন্ত সীমিত। আবার যে সব প্রতিষ্ঠান মুনাফা বণ্টন না করে সেই মুনাফাকে পুনর্বিনিয়োগ করবে সেই সব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনুন্নত দেশে অত্যন্ত কম।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটু আগে যা বলা হয়েছে তার সপক্ষে যুক্তি আপেক্ষিকভাবে তীব্র; অনুন্নত দেশে কিছু পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবেই; কারণ ক্রেতার ব্যক্তিগত আয় ও ভোগসামগ্রী সরবরাহের মধ্যে একটা সাময়িক ব্যবধানগত, স্বল্পকালীন পার্থক্য থাকবেই। আর

অন্যদিকের বিচারে এই মুদ্রাস্ফীতিও প্রয়োজনীয়। তবে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। আর বাস্তবের বিচারে তা করা উচিত। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে যদি অর্থ-মূল্য-হ্রাস ব্যবস্থাকেই (inflationary process) দীর্ঘকালীন পন্থা বলে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রচণ্ড বিপর্যয় আনবে। দেশের অর্থনীতি উন্নত হচ্ছে কিন্তু তা নিজের সমূহ ক্ষতি করেই উন্নত হচ্ছে (lifting on its our boot straps)। পরিকল্পনা কমিশন এদিকটার ওপর হয়ত কোন গুরুত্বই দেননি। অর্থের ক্রয়শক্তি যে ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? প্রথম পরিকল্পনার শেষে তা শতকরা ২৯ ভাগ কমে গিয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে টাকার মূল্যহ্রাস ঘটেছে অবশ্যই আরো অনেক বেশি।

কাজেই মুদ্রাস্ফীতির সপক্ষে যুক্তিগুলির কোনই বাস্তব সার্থকতা নেই। ইনফ্লেশনের তাগিদে অর্থনৈতিক অপচয়, অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা, সামাজিক ক্ষতি, এগুলি সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হয়ে থাকে। সামাজিক বৈষম্যজনিত একটি সংক্রমণশীল অর্থব্যবস্থায় (subsistence economy) যখন মুনাফার অংশ বেড়ে গিয়ে মজুরীর অংশ কমতে থাকে তখন জাতীয় আয়ের এই বণ্টনজনিত অসাম্য বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর হয়। অনাবশ্যক বিক্ত অংশের থেকে সমৃদ্ধ অংশের দিকে যখন আয়ের বণ্টনগতি পরিচালনা করা হয় তখনই সামাজিক উন্নতির গতি প্রকৃতি বিপরীতমুখী হতে সুরু করে এবং নানারকম সঙ্কট দেখা দেয়।

তাই, একটি অর্থনৈতিক বিনিয়োগ সাফল্যের ভিত্তি হ'ল সঞ্চয়কারী মানুষেরা। অর্থনৈতিক উন্নতির সূচনা হয় সঞ্চয়ের প্রান্তিক ও পরিমাণগত বৃদ্ধি থেকে। কিন্তু ইনফ্লেশনে প্রান্তিক সঞ্চয়কারীদের (marginal savers) কিছু করবার থাকে না। আমাদের অবশ্য তাগিদে কিছুটা বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (forced saving) করে কিন্তু তাতে প্রকৃত প্রয়োজন মেটান যায় না। এর কারণ টাকার মূল্য ক্রমশঃই কমে যেতে থাকে। সুতরাং ইনফ্লেশন রোধ করতে না পারলে কোন দিকেই শুভ ফলের আশা নেই। নীতিহীন মুদ্রাস্ফীতি ক্রমাগতই দুর্বার হতে থাকে। যেমন আমাদের দেশে বর্তমানে হচ্ছে। আবার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে গেলে মজুরীকে জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়, আমদানির উপরে কোটা (quota) বসাতে হয়, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এগুলির মধ্যে দিয়ে আর্থিক ব্যবস্থা কিন্তু জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। তাই আমাদের এই সিদ্ধান্ত যে, ইনফ্লেশন কখনই একটি সুষ্ঠু আর্থিক ধারা চিরস্থনভাবে গড়ে তুলতে পারে না। উপরন্তু তাতে নানারকম বাধাবিপত্তির সৃষ্টি হয়।

তাই আমাদের অভিমত এই যে একটি সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শুধু উৎপাদন বাড়ালেই সব সমস্যার সমাধান করা হবে না। অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটি

ব্যাঙ্ক আমানতের নিরাপত্তা

অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথবন্ধু দত্ত

পরের টাকা লইয়া ব্যাঙ্কের কারবার। ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ চল্‌তি হিসাবে, সেভিঙ্গ হিসাবে এবং স্থায়ী বা স্থির জমায় আমানত গ্রহণ করে। যে আমানত যত বেশী দিনের জন্য, তাহাতে তত বেশী সুদ দেওয়া হয়। চল্‌তি হিসাবে বা জমায় অনেক ব্যাঙ্ক সুদ দেয় না, আর যাহারা সুদ দেয়, তাহাও অতি অল্প। হিসাবে খুব কম জমা থাকিলে কিম্বা একটা বড় অঙ্কের উপর জমা হইলে তাহাতে সুদ দেওয়া হয় না। সেভিঙ্গ আমানতে সুদ বেশী দেওয়া হয়, তবে টাকা তুলিয়া লওয়ার নিয়মে কিছু কিছু বাধা আছে। চল্‌তি হিসাবে হিসাবের খত যখন তখন বা একবারে সকল টাকা তোলা যায় না। সেভিঙ্গ হিসাবেও চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়; এজন্য চল্‌তি হিসাবের কতকগুলি সুবিধা পাওয়া যায় এবং হিসাব রাখিবার জন্য ব্যাঙ্ক কোন চার্জ (ইনসিডেন্টাল) নেয় না ইহাও একটা সুবিধা। বর্তমানে সেভিঙ্গ আমানতে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও জমার অবস্থা ভেদে বার্ষিক সুদ দেয় শতকরা ২ হইতে ৩ টাকা। স্থির (fixed) আমানতের সুদ স্বভাবতই বেশী। এইরূপ আমানতে ব্যাঙ্কের সহিত গ্রাহকের সম্পর্ক হইবার—মাত্র টাকা জমা দিবার এবং টাকা ফেরৎ পাইবার সময়। চল্‌তি জমা এবং সেভিঙ্গ জমায় ব্যাঙ্কের সহিত

(৪৯৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ভারসাম্য বিধান করতে হবে। আর তখনই তা স্বয়ংক্রিয় ভাবে চলাচল হতে থাক (self-propelling process)। এর জন্য দরকার সুচিন্তিত মূল্যনীতি প্রণয়ন যার উপর ভিত্তি করে দেশের মূলধন, উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থা গড়ে উঠবে। অর্থের মূল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে ক্রেতা ও উৎপাদক সকলেরই টাকার উপর আস্থা ফিরে আসবে। পরিশেষে বলা যেতে পারে যে এর মধ্যে দিয়ে সামাজিক আয় বন্টনের অবাঞ্ছিত এবং আকস্মিক পরিবর্তনসমূহ এড়ানো যেতে পারে। সেটা মস্ত বড় কথা; এই জন্যই মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নতির বিকল্প পন্থা নয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে তা একান্তরূপে অপরিহার্য এবং অসীম প্রয়োজনীয়।

গ্রাহকের ঘনিষ্ঠতা বেশী এবং আইনের চোখে ইহারাই প্রকৃত গ্রাহক। কিন্তু স্থির জমার গ্রাহক সাময়িক খদ্দের মাত্র।

ব্যাঙ্ক ও আমানতকারীর পরস্পর সম্পর্ক আইনের চোখে দেনদার (ডেটার) এবং পাওনাদারের (ক্রেডিটার) সম্পর্ক। ব্যাঙ্ক যে টাকা আমানত গ্রহণ করে তাহা গচ্ছিত রাখিবার জন্য নহে। ব্যাঙ্ক কর্জ দেবার জন্যই কর্জ গ্রহণ করিয়া থাকে। যে গচ্ছিত রাখিবার জন্য অর্থ বা জমা গ্রহণ করে সে টাকা খাটাইতে পারে না। টাকা খাটাইবার তাহার আইনতঃ অধিকার নাই। সে এই টাকার অছি বা ট্রাষ্টি মাত্র উহার রক্ষণাবেক্ষণই তাহার কাজ। ব্যাঙ্ক যখন সেফ কাষ্টোডিতে কোন কিছু গ্রহণ করে তখন তাহার কাজটা হয় অছিগিরি বা রক্ষণের কাজ। সেফ্ কাষ্টোডির দ্রব্যাদি যেরূপভাবে গ্রহণ করিবে তেমনই জমাকারীকে ফিরাইয়া দিতে হইবে, ইহাই আইনের বিধি। ইহার ব্যতিক্রম হইলে বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ (Breach of Trust) হয়।

ব্যাঙ্কের আমানতের টাকা গ্রাহকগণের নিকট হইতে ধার বা কর্জ নেওয়া অর্থ। উহার মানে এই দাঁড়ায় যে ব্যাঙ্ক কতকগুলি সর্তে গ্রাহকগণের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়াছে এবং ঐ সর্তানুযায়ী উহা গ্রাহকগণকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য। উভয় পক্ষকেই এই আমানত সম্পর্কে সর্ত পালন করিয়া চলিতে হইবে। ধরুন, চলতি আমানতের কথা। কতকগুলি নিয়ম মানিয়া লইয়া একজন গ্রাহক এই আমানতের হিসাব খুলিয়াছে এবং এজন্য ব্যাঙ্কের অপর একজন গ্রাহক বা ব্যাঙ্ক পরিচিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এই নূতন গ্রাহকের পক্ষে সুপারিশ করিতে হইয়াছে (Introduction)। হিসাব খোলার পরে গ্রাহক ব্যাঙ্ক হইতে যথারীতি চেক বই ইত্যাদি পাইয়াছে। নিয়ম অনুযায়ী তাহার হিসাবে টাকা জমা থাকিলে ব্যাঙ্কের অন্যান্য নিয়ম মানিয়া সে যে কোন সময় চেক কাটিয়া নিজে টাকা উঠাইতে বা অপরকে টাকা দিতে পারে। ব্যাঙ্কে বহুলোকে টাকা আমানত রাখে। সকলেই এক সঙ্গে টাকা তোলে না। অনেক টাকা সকল সময়ই অবশ্য চেক দ্বারা তোলা হয়; তবুও সকল সময়ই বহু টাকা ব্যাঙ্কের তহবিলে পড়িয়া থাকে। এই টাকা ব্যাঙ্ক সুবিধামত সর্তে খুব সাবধানে ব্যবসায়-বাণিজ্যে কর্জ দেয়। ইহা হইতে ব্যাঙ্কের লাভ আসে। ব্যাঙ্কগুলি টাকার পাহারা দেয় না, টাকা খাটায়। এই কারণে আমানতকারীকে সুদ দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভব হয়।

কিন্তু সকল সময়ই যে ব্যাঙ্কের টাকা সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত হইবে এরূপ আশা করা যায় না। প্রত্যেক ব্যবসায়ের বিপদ-আপদ আছে। ব্যাঙ্কও উহা হইতে মুক্ত নহে। ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ঠিক ভাবে চলিতেছে কিনা এবং প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কার্য আইনসঙ্গতভাবে এবং নিরাপদে ব্যবসাসম্মতভাবে চলিতেছে কিনা এ বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেছে। প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে, ষান্মাসিক ও বার্ষিক নানারূপ হিসাব পত্রের

নকল, তথ্যাদি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট দাখিল করিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সকল পরীক্ষা করিয়া কোন নির্দেশ দিলে প্রত্যেক ব্যাঙ্কেরই তাহা পালন করিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা এত বেশী যে, যে কোন ব্যাঙ্কের প্রায় সকল প্রকার কার্যের উপর ইহা হস্তক্ষেপ করিতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের বাঁচিবার কোন উপায় না থাকিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইহার কার্যাবলী বন্ধ করিয়া দিবার ক্ষমতা রাখে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন পাশ হয় ১৯৩৪ সনে এবং ১৯৩৫ সনের ১লা এপ্রিল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কার্য আরম্ভ করে। ১৯৪৯ সনে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন পাশ হয়; এই আইন পাশ হইবার পূর্বে ভারতের ব্যাঙ্কসমূহের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যথাযথ নির্দেশ,—এক কথায় খবরদারির করিবার মত বিশেষ কোন ব্যবস্থাই ছিল না বলা চলে। ১৯৪৯ সালে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন পাশ হইলেও পরবর্তী কয় বৎসরে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইহার বহু সংশোধন ও পরিবর্তন হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে লাইসেন্স বা অনুমতি না লইয়া কোন প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কের কার্য করিতে পারে না—সে প্রতিষ্ঠান অভারতীয় বা ভারতীয়, যাহাই হউক। আর যে সকল ব্যাঙ্কের-আদায়ীকৃত মূলধন বা মূলধন ও রিজার্ভ মিলাইয়া পাঁচ লক্ষ টাকার তদূর্ধ, আইন মতে উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীল ভুক্ত হইতে পারে। তপশীলভুক্ত এবং তপশীলের বাহিরের ব্যাঙ্ক সকলকেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়। অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দেশ ব্যতীত যে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া থাকে, তাহাও সাদরে পালিত হয়, বলা বাহুল্য।

ব্যাঙ্ক সুপরিচালন সমস্যা সর্বদেশে এবং সর্বকালেই একটি বিশেষ সমস্যা। অন্যান্য ব্যবসায়ের মত ব্যাংক ব্যবসায়েরও উত্থান, পতন ও মৃত্যু আছে। কিন্তু ব্যাংকের পতনে সমাজের যত লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এরূপ আর কিছুতেই নহে। লোকের দৈনন্দিন আয়ের অর্থ ত বটেই আজন্মের পুঁজি ভরসা করিয়া লোকে ব্যাংকে জমা রাখে। সুতরাং ব্যাঙ্ক যখন ফেল পড়ে তখন লোকের আর্থিক দুর্দশার অবধি থাকে না। এই জন্য ব্যাঙ্ক ব্যবসা ত্রুটী মুক্ত রাখার জন্য দেশের গবর্ণমেণ্টের তথা রিজার্ভ ব্যাংকের এই খবরদারি।

আমানতকারিগণের সুবিধার জন্য ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন সংশোধন করিয়া কোন ব্যাংক দেউলিয়া হইলে উহার লিকুইডেশন যাহাতে শীঘ্রই শেষ হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যাংক ব্যবসায়ের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য যাহাতে কয়েকটি ব্যাংক এক সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে পারে [amalgamated] তজ্জন্যও ১৯৪০ সনে আইন সংশোধন করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানতকারিগণের আংশিক নিরাপত্তার জন্য আইনে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে লেভিল ব্যাংকের আমানতকারিগণকে তাহাদের প্রত্যেকের আমানতের অনধিক ১০০ টাকা ব্যাংক লিকুইডেশনে যাওয়ার অল্পকাল মধ্যেই ফেরৎ দিতে হইবে। ১৯৬০ সনে এই ব্যবস্থা আরও সংশোধন করিয়া ১০০ টাকা স্থলে ২৫০ টাকা করা হইয়াছে। যাহাতে কোন ব্যাংক হঠাৎ টাকা তোলার হিড়িকে ফেল না হয়, এজন্য যেরূপ একদিকে মোরেটো-

রিজার্ভ' বা কোর্টের অনুমতি লইয়া নির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা আছে, অন্যদিকে ১৯৬০ সনে ব্যাংকিং কোম্পানী আইনের সংশোধন করিয়া যাহাতে পতনোন্মুখ ব্যাংককে অপর সুদৃঢ় ব্যাংকের সহিত সংযুক্ত করিয়া রক্ষা করা যায় এবং আমানতকারীর স্বার্থ রক্ষিত হয় এরূপ বাধ্যতামূলক আইনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সত্ত্বেও ব্যাংকের পতন একেবারে নিরোধ করা যাইবে, ইহা কেহই বিশ্বাস করে না। বিশেষতঃ গ্রাহকগণ কোন একটি ব্যাংক টাকা দেওয়া বন্ধ করিলে অপর ব্যাংকগুলির উপর যে দৌড় চালায় তাহা রোধ করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। সর্বসাধারণের ব্যাঙ্ক আমানতের উপর নিরাপত্তা বোধ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আরও কিছু করা প্রয়োজন সকলেই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। সম্প্রতি পালাই সেন্ট্রাল ব্যাংক ও লক্ষ্মী ব্যাংক ফেল পড়িলেও আরও পাঁচটি ব্যাংকের মোরেটোরিয়াম ঘোষণা করিলে বিষয়টার গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করিয়া লন এবং জনমত ব্যাংকে আমানতের বীমাকরণ সম্পর্কে দৃঢ় হয়।

ব্যাঙ্ক আমানত বীমাকরণ একমাত্র আমেরিকায় দেখা যায়। ১৯৩০ সালে যখন বিশ্বে ও আমেরিকায় ভীষণ মন্দা দেখা দেয় তখন আমেরিকায় ১৯৩০-৩৩ মধ্যে প্রায় ৫০০০ ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। ১৯৩৩ মার্চ মাস হইতে সে দেশে এরূপ অবস্থা হয় যে প্রত্যেকে ষ্টেটের বহু ব্যাঙ্কই কার্য বন্ধ করে এবং যে ব্যাঙ্কগুলি কাজ বন্ধ করে নাই তাহারাও কার্যাদি খুবই কমাইয়া দেয়। এই জাতীয় আর্থিক দুর্দশায় তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিষ্টার ফ্র্যাঙ্কলীন ডি রুজভেল্ট 'নিউ ডিল' নামক এক জাতীয় কার্য-সূচী গ্রহণ করেন। এই কার্য-সূচীর অংশরূপে একটী নূতন ব্যাঙ্কিং আইন ১৯৩৩ সালে পাশ হয় এবং ইহার বলে ফেডারেল ডিপজিট ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সে দেশের সমস্ত জাতীয় ব্যাঙ্কের "(National Banks)" পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানে চাঁদা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। ৫০০০ ডলার পর্যন্ত (পরে ইহা বাড়াইয়া ১০,০০০ ডলার করা হইয়াছে) প্রত্যেক আমানতকারীর জমা এরূপে বীমা দ্বারা রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়। এই বীমার জন্য প্রত্যেক সদস্য ব্যাঙ্ককে শতকরা ১ভাগের ১/১২ মাত্র চাঁদার ব্যবস্থা হয় এবং কোন দুর্ঘটনা না হইলে এই চাঁদারও অংশ বিশেষ ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়; তাহাতে নিট চাঁদা দাঁড়ায় শতকরা ১ ভাগের ১/২৮ মাত্র।

মার্কিন দেশে ব্যাঙ্কের আমানত-বীমায় সুফল পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশ ব্যাঙ্ক ফেল সম্বন্ধে মার্কিনের সমকক্ষ না হইলেও ইতিমধ্যেই বেশ দুর্নাম অর্জন করিয়াছে। বিশেষতঃ দেশ যখন কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতর দিয়া চলিয়াছে তখন আর্থিকক্ষেত্রে সর্বসাধারণ ব্যাঙ্কের আমানত সম্পর্কে নিরাপত্তা অনুভব না করিলে সঞ্চয়ের চেষ্টায় বাধা পাইতে বাধ্য। সাধারণ লোক ভাল-মন্দ ব্যাঙ্ক বোঝেনা। এদেশের শিক্ষিত লোকেরও অনেকের ধারণা যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীল ভুক্ত ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নিরাপদ। লক্ষ্মী বা পালাই ব্যাংক ফেল পড়িতে দেখিলে লোকের যে কোন ব্যাঙ্কের উপর অনাস্থা আসিবে

তাহাতে আর আশ্চর্যের কিছুই নাই। সুতরাং বর্তমান ব্যাঙ্কের আমানত বীমা প্রবর্তনের খুবই উপযুক্ত সময়, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

১৯৫০ সালে যখন ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি হয় তখন এদেশে ব্যাঙ্কের আমানতের বীমার কথা উঠে। কিন্তু তখন ইহা জনমতের (ব্যাঙ্ক জগতের) বিশেষ সমর্থন পায় নাই। ১৯৫৯ সালের ব্রক কমিটি এই প্রশ্নটি আবার তোলে—তখন হইতে সর্বসাধারণের মত এবং এবং ব্যাঙ্কারগণের মত বিষয়টি আগ্রহের সহিত চিন্তা করিতে থাকে। সম্প্রতি কয়েকটি ফেল হওয়ায় বিষয়টি গুরুত্ব এত বাড়িয়া যায় যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিষয়টী গ্রহণ করে এবং এই বিষয়ে ভারত সরকারকে একটি আইন প্রণয়ন করিতে এবং একটী ডিপজিট ইন্সিওরেন্স করপোরেশন স্থাপন করিতে পরামর্শ দেন।*

গত ৩১ শে আগষ্ট এই সম্পর্কিত বিল লোক সভায় উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন হইবে এক কোটী টাকা। সমস্ত মূলধন সরবরাহ করিবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া। ইহা সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও ইহার নিয়ন্ত্র ব্যাঙ্কগুলির আমানত বীমা করিবে। কোন ব্যাঙ্কের জমা ভারতের বাহিরে থাকিলে তাহা বীমার অন্তর্ভুক্ত হইবে না এবং ভারত ও রাজ্য সরকারগণের আমানতও বীমার বাহিরে থাকিবে। বর্তমানে ১০০০ টাকা পর্যন্ত বীমার অন্তর্ভুক্ত হইবে; তবে, পরে এই অঙ্ক ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে বাড়ান যাইতে পারিবে। কি রেটে চাঁদা দিতে হইবে তাহা করপোরেশন নিজেই বিভিন্ন সময়ে নির্ধারণ করিবে। তবে একসঙ্গে টাকা বীমার জন্য এই চাঁদার হার বার্ষিক ১৪ নয়াপয়সার বেশী হইবে না।*

এই করপোরেশনের প্রধান কার্যস্থল বোম্বাই সহরে থাকিবে। পাঁচ জন ডাইরেক্টর ইহা পরিচালনা করিবেন—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর ইহার চেয়ারম্যান হইবেন। দুইজন ডাইরেক্টর বেসরকারী লোক হইবেন এবং ইহারা বীমার অন্তর্ভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট হইবে না। এই বিলের প্রস্তাব মতে যখন কোন ব্যাঙ্কের লিকুইডেশন অথবা পুনর্গঠন বা একত্রীকরণ বা অন্যান্য ব্যবস্থা অনুযায়ী আমানতকারীকে জমার টাকা ফেরত দিবার সময় আসিবে তখনই এই করপোরেশনের দায়িত্ব বর্তিবে ও ইহা পালন করিতে হইবে।

ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রস্তাব, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মতামত এবং ১৯৫৯ সালের ব্রক কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করিয়া তবে বর্তমান খসড়া আইনটি লোক সভায় উপস্থাপিত করিয়াছেন।

আমেরিকায় ফেডারেল ডিপজিট ইন্সিওরেন্স করপোরেশন স্থাপিত হয় ১৯৩৩ সালে—ইহা পৃথিবীর প্রথম ডিপজিট বীমা প্রতিষ্ঠান। এরকমের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান ১৯৬১ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। আশা করা যায়, ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ইতিহাসে ইহা নবযুগ আনিবে এবং ভারতে জনসাধারণ আমানতের নিরাপত্তা হেতু আরও ব্যাঙ্কমুখী হইবে।

আগামীকালের শিক্ষণ ব্যবস্থা

শ্রী এল. এন, মিশ্র
কেন্দ্রীয় শ্রম, কর্মসংস্থান ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী

আমাদের দেশে কর্মসংস্থান পরিস্থিতি একটা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। যে সকল কর্মীর কর্মসংস্থান আমরা করিতে পারিনা তাহাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। অপরদিকে আবার কারিগরী কর্মীর দারুণ অভাব রহিয়া গিয়াছে। এমনকি আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রাখাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অথচ আগামী পাঁচ বৎসরে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে হইবে। এই পরিকল্পনাটি পূর্ববর্তী দুই পরিকল্পনার প্রায় সমান। তাহা ছাড়া, নোটের উপর পরিকল্পনা বলিতে সম্পত্তির নক্সাকেই বোঝায়, প্রস্তাবিত ভবনটি একটির পর-একটি ইট গাঁথিয়া সেই নক্সা অনুযায়ী নির্মাণ করিতে হয়। কিন্তু আমাদের সেই সব দক্ষ কর্মী কোথায়? ইহার একমাত্র উত্তর হইল ব্যাপকশিক্ষণ ব্যবস্থা। জাতীয় শিক্ষণ সপ্তাহের প্রধান উদ্দেশ্য হইল আমাদের পরিকল্পনার এই দিকটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এদিকে আমাদের প্রয়োজন কতখানি এবং তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী কর্মীদল গঠন করিতে হইলে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে জনসাধারণকে সে সম্বন্ধে অবহিত করিয়া তোলাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

তিনটি পর্যায়ে কারিগরী কর্মী প্রার্থীদের দরকার—স্নাতক, ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত এবং দক্ষ কর্মী। মোটামুটি হিসাবে বলা যায় তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আমাদের অতিরিক্ত ৪০,০০০ স্নাতক ইঞ্জিনীয়ারের প্রয়োজন হইবে। ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কর্মীর চাহিদা হইবে ইহার দ্বিগুণ। তাহা-ছাড়া প্রায় ১০ লক্ষের মত কিছু কর্মী দরকার হইবে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে দেখুন, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে আমাদের আছে ১০০টি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। এগুলি হইতে বৎসরে ৫,৭০০ ইঞ্জিনীয়ার বাহির হইয়া আসিতে পারে। তাহা ছাড়া আছে ২০০টি কারিগরী শিক্ষালয়, সেখানে বৎসরে ৮,০০০ শিক্ষার্থী ডিপ্লোমা লাভ করিতে পারে। তৃতীয় পরি-কল্পনাকালে এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলিও তখন বৎসরে ১২,০০০ এবং কারিগরী শিক্ষালয়গুলিতে বৎসরে ১৯০০০ শিক্ষার্থী শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে পারিবে।

ইহা ছাড়া আমাদের যে লক্ষ লক্ষ কারীগর প্রয়োজন হইবে, তাহার জন্য একটি জাতীয় শিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কর্মসূচী অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন সংস্থানে শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ১৬ হইতে ২৫ বৎসরের যুবকদের বিভিন্ন কাজ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এখানে শিক্ষা লাভের পর তাহারা বিভিন্ন শিল্পে যাইয়া নিজ হাতে কাজ করিতে

পেশে। প্রথম পরিকল্পনাকালে এইসব শিক্ষণ কেন্দ্রের প্রায় ১০,০০০ আসন ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে তাহা বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ৪৩,০০০। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে আসন সংখ্যা আরও বাড়াইয়া এক লক্ষেরও বেশী করা হইবে। বর্তমানে দেশে ১৬৭টি শিক্ষণ কেন্দ্র আছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই সংখ্যা বাড়িয়া হইবে ৩১৮টি। শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণের উৎকর্ষ সাধনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। দেশের সর্বত্র শিক্ষণ ব্যবস্থার মান যাহাতে একরূপ থাকে সেজন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইতেছে।

উদ্বাস্তুদের শিক্ষণের জন্য আমরা কয়েকটি পরিকল্পনা চালু করিয়াছি। এই সকল পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট ৩,০০০ উদ্বাস্তু শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া আমরা অনেকগুলি কর্ম ও নবশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করিয়াছি। আমরা এখন এই উভয় পরিকল্পনা মিলাইয়া কারিগরী শিক্ষণের একটি মূল পরিকল্পনা চালু করিবার প্রস্তাব করিয়াছি।

শিক্ষণের মান রক্ষা করিয়া সম্প্রসারণ পরিকল্পনা চালু করিয়া একটি প্রধান অসুবিধা হইল উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। আমরা ইহার জন্য ব্যবস্থা রাখিয়াছি। প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ছিল ৪টি। প্রথম পরিকল্পনার শেষে ইহাদের আসন সংখ্যা ছিল ১৪০। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে তাহা বাড়িয়া হইয়াছে ৪০০তের বেশী। চালু সংস্থাগুলির সম্প্রসারণ ছাড়াও নূতন তিনটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব রহিয়াছে। ইহার ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট আসন সংখ্যা বাড়িয়া হইবে ৮০০।

শিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের কর্মসূচী রূপায়িত করা খুব সহজ সাধ্য হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। একদিকে যেমন শিক্ষকের অভাব ছিল আরেকদিকে তেমনি অভাব ছিল দাজ সরঞ্জামের। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, কারিগরী সহযোগিতা মিশন এবং রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ পরিকল্পনা তহবিল হইতে আমরা যে সাহায্য লাভ করিয়াছি সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

কারিগরী শিক্ষালয়ের এই পরিকল্পনার দ্বারা তৃতীয় পরিকল্পনার কারিগরী কর্মীর চাহিদা মিটিবে না তাহা আমরা ভালো করিয়াই জানি। সেজন্য আমাদের তরুণদের শিক্ষণের সুযোগ দিবার জন্য আমরা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছি। উন্নয়নশীল দেশে শিল্পকে শিক্ষায় কিছুটা ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। এই আদর্শের ভিত্তিতেই আমরা জাতীয় শিক্ষানবিশী শিক্ষণ পরিকল্পনা চালু করিয়াছি। আগামী কয়েক বৎসরে ইহা আরও সম্প্রসারিত করা হইবে। এজন্য একটি আইন চালু করা হইতেছে। তাহার উদ্দেশ্য হইল তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে শিক্ষানবিশী পরিকল্পনার মাধ্যমে ১৫,০০০ তরুণের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

এইসব ব্যবস্থা ছাড়াও কর্মনিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আমরা সান্ধ্যকালীন ক্লাশের পরিকল্পনা প্রবর্তন করিয়াছি। যে সকল কর্মী বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত আছেন এবং যাহারা তাহাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করিতে উৎসুক, তাহারা এই পরিকল্পনার দ্বারা লাভবান হইবে। ইতিমধ্যেই এই পরিকল্পনা বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমানে ২০০০ কর্মী শিক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহা পাঁচ গুণেরও বেশী সম্প্রসারিত হইবে।

পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য যেসব দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন, তাহাদের শিক্ষণের জন্য যে চেষ্টা চলিয়াছে, উপরে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করা হইল। কারিগরী জ্ঞান বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও শিল্পায়নের ফলে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয় যাহাতে সাধারণ মানুষেরও কারিগরী জ্ঞানের মান বৃদ্ধি করে। শিল্পোন্নত দেশেই মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে নানাক্ষেত্রে নানাকাজে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সংস্পর্শে আসিতে হয় বলিয়া যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তাহার জ্ঞান আপনা আপনি বাড়িয়া চলে। বলাই বাহুল্য এইরূপ ব্যক্তির কারিগরি জ্ঞান ক্লাশের শিক্ষা প্রাপ্ত কর্মীর তুলনায় বেশী হইবে। আমাদের দেশেও শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিবে যখন মানুষের মনোবৃত্তি এবং কারিগরী জ্ঞানঅর্জনের সুযোগ স্বতঃই সম্প্রসারিত হইবে। তবে এখন এই প্রবৃত্তিকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। আমাদের সমগ্র শিক্ষণ পরিকল্পনাই সেই প্রক্রিয়ার একটা অংশ মাত্র।

———

আনন্দোৎসবে অপরিহার্য

"কাকাতুয়া" মার্কা ময়দা "হ্যারিকেন" মার্কা ময়দা
"গোলাপ" মার্কা আটা "ঘোড়া" মার্কা আটা

প্রস্তুতকারক :

দি হুগলি ফ্লাওয়ার মিলস কোং লিঃ
দি ইউনাইটেড ফ্লাওয়ার মিলস কোং লিঃ

ম্যানেজিং এজেন্টস :

শ ওয়ালেস এণ্ড কোং লিঃ

নিবেদক: চৌধুরী এণ্ড কোং, ৪/৫, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

[৪৪০ পৃষ্ঠার পর]

এইরূপ দীর্ঘ মেয়াদী পরিপ্রেক্ষিতের অনেক গুরুত্ব আছে। স্বল্প মেয়াদী নীতি ব্যয়-সাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিকল্প নীতি অল্প সময়ের মধ্যে সুফল দর্শন করিলেও তাহার সুদূর প্রসারী ফলের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদনই আমাদের লক্ষ্য নয়, ৩০ বৎসরের মধ্যে সর্বাধিক হারে উৎপাদন সম্ভব করিয়া তোলাই আমাদের লক্ষ্য। যে ধাঁচে অর্থ বিনিয়োগ করিলে অল্প সময়ে সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব হয়, সেই ধাঁচে অর্থ বিনিয়োগের ফলে উৎপাদনের হার সর্বাধিক হইবে না। ভারতের উন্নয়ন নীতি সম্পর্কে যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা এই দুইটি ব্যাপারের সম্যক অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, অবিলম্বে সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হউক। কিন্তু উহাতে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের হার কমিবে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে দীর্ঘ মেয়াদী পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পরিকল্পনাকারীদের পরিকল্পনা রচনা করা উচিত কি না। রাজা নীতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, উহাই ঠিক। যে নীতির দ্বারা পাঁচ বৎসরে সর্বাধিক আয় সম্ভব হয় তাহা দ্বারা লক্ষ্য সাধিত হইতে পারে না। জীবনধারণের মান যথেষ্ট উন্নত করিতে হইলে এবং দেশের বেকার সমস্যা হ্রাস করিতে হইলে অন্ততঃ ৩০ বৎসরের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করা দরকার।

ভারী মূলধনী পণ্য

আর্থিক অগ্রগতির সহজ পদ্ধতি হইতে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, যে ধাঁচে অর্থ বিনিয়োগ করিলে মূলধনী মালের উন্নয়নে অর্থ কেন্দ্রীভূত হয়, তাহাতে দীর্ঘ মেয়াদে অর্থ বিনিয়োগের প্রসারের হার দ্রুত বৃদ্ধি হয়। দীর্ঘ মেয়াদী পরিপ্রেক্ষিতে মূল ও ভারী মূলধনী পণ্য শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন দ্বারা সর্বাধিক অর্থ বিনিয়োগ সম্ভব হইতে পারে। ইহাই আমাদের পরিকল্পনা নীতির মূল কথা।

ভারি শিল্প ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা সমর্থন করা যায় এই জন্য যে, আয়-প্রসারের পক্ষে এই সকল শিল্পের উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। যেরূপ শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা করা হইয়াছে—তাহাতে আর্থিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটিবে এবং উন্নয়নের উৎসাহ জাগিবে।

পরিবর্তনের যুগে মূলধনী মালের উন্নয়ন ঘটাইতে গেলে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি হইবে। মূলধনী মাল তৈয়ারের জন্য আবশ্যক যন্ত্রপাতি, মূল কাঁচামাল ও অন্যান্য কাঁচা উপকরণ এদেশে উৎপাদন করা যাইতে পারে না, সেগুলি বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানি করিতে হইবে। বিদেশে রপ্তানীযোগ্য ভারতের প্রধান প্রাথমিক পণ্য হইল চা, পাট, সুতীকাপড়। এসব দ্রব্য বিদেশে খুব বেশী বিক্রয়ের সুবিধা নাই। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে বৈদেশিক

মুদ্রা অধিক উপার্জনের উপায় নাই। সেজন্য আমদানী হ্রাসমূলক শিল্পের উন্নয়নের দিকে মনোযোগী হইতে হইবে। আসল কথা হইল, যে সব মূলধনী মাল এখন আমদানি করিতে হয়, সেগুলি এদেশেই উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মূলধনী সরঞ্জাম ও মূল কাঁচা উপকরণ উৎপাদনের দিক দিয়া ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে হইবে।

পরিবর্তনের সময় প্রয়োজন ও উপার্জনের মধ্যে ব্যবধান থাকায় বৈদেশিক সাহায্য দরকার। কিন্তু এই বৈদেশিক সাহায্য এমন উন্নয়ন ঘটাইবে যাহার ফলে আর বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রথমে রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা মূলধনী মাল উৎপাদন শিল্পের উন্নয়নে ব্যয় করা সমীচীন কি না। ভারতের আর্থিক কাঠামোর যে অবস্থা এবং শিল্প পরিধি যেরূপ সীমিত তাহাতে মূলধনী মালি উৎপাদন অবস্থার উন্নয়ন সাধনের পূর্বে রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে অগ্রগতি হ্রাস পাইবে। আগামী ২০/৩০ বৎসরে অগ্রগতি যথাসম্ভব অধিক করিতে গেলে মূল শিল্পের উপর জোর দিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত মূল শিল্প ও শিল্পোন্নয়নের ফলে নূতন ধরণের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে। শিল্প রপ্তানি বৃদ্ধি হইলে ভারী শিল্পের উন্নয়ন সফল হইবে।

বৈদেশিক সাহায্যের উপর ভরসা

বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা দূরদৃষ্টি দিয়া দেখিলে ঠিক মনে হয়। গত ২০।৩০ বৎসরে আন্তর্জাতিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহার কথা মনে করিলে ইহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়ন সাধন করা উন্নত দেশগুলির কর্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। গত ১০ বৎসরে বিভাগীয় সাহায্য যে পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নীতি খুব খারাপ মনে হয় না।

তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হইলে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, পরিকল্পনা রূপায়নে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব। যাহা হউক, যেভাবে বিশ্বের উন্নত দেশগুলি ভারতকে সাহায্য দিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা আশাব্যঞ্জক।

উন্নয়ন নীতির মূল লক্ষ্য হইল এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাহাতে বাহিরের সাহায্যের উপর বেশী দিন নির্ভর করিতে না হয়। নূতন রপ্তানি ব্যবস্থা করিতে সময় লাগে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এদেশে পণ্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া রপ্তানি বৃদ্ধির কঠোর নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা

খাদ্যশস্যের দিক দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ হইল ভারতের আর্থিক উন্নয়ন নীতির তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া

হইয়াছে। কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কৃষি বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা বলা হয় নাই। জনগণের জীবনধারণের মান উচ্চ করিবার প্রচেষ্টায় খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের প্রয়োজনীয়তা সমধিক বলিয়াই কৃষি বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ, অন্নাভাব ও ঘাটতি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে হইবে এবং বিদেশী খাদ্যশস্য আমদানির উপর নির্ভরতা হ্রাস করিতে হইবে।

সামাজিক ও আর্থিক লক্ষ্য

ভারতের উন্নয়ন নীতির এই সব আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত অন্যান্য বহু বিষয় বিবেচনার মত আছে। পরিকল্পনার দুইটি লক্ষ্য : সামাজিক ও আর্থিক। কেবলমাত্র উৎপাদনের হার যথাসম্ভব অধিক করিয়া সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য সাধন করা যাইবে না। আর্থিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের মধ্যে কিছু সংঘর্ষ আছে। আমাদের উন্নয়ন নীতিতে এমন কতকগুলি নীতি আছে যেগুলির দ্বারা এই সংঘর্ষ দূরীভূত হইতে পারে।

আমাদের উদ্দেশ্য হইল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করা। আমাদের উন্নয়ননীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল সরকারী উদ্যোগের উন্নয়ন। শুধু ক্রত উন্নয়নের জন্যই যে সরকারী উদ্যোগের উন্নয়ন সাধন করা হইতেছে তাহা নয়, বেসরকারী উদ্যোগে সম্পদ যাহাতে অন্যায়ভাবে কেন্দ্রীভূত না হয় সেজন্য ঐ ব্যবস্থা করা হইতেছে। ১৯৪৮ ও ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি প্রস্তাবে সরকারী উদ্যোগের উন্নয়নের কতকগুলি পন্থা ঠিক করা হইয়াছিল। ঐ সকল পন্থা অবলম্বন করিয়া কাজ করা হইতেছে বলিয়া পরিকল্পনায় দেখান হইয়াছে। ১৯৬১ সালে যেখানে সরকারী উদ্যোগে শিল্পোন্নয়নের শতকরা ১০ ভাগ উৎপাদন সম্ভব, সেখানে ১৯৬৫ সালে উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ সরকারী উদ্যোগেই সম্ভব হইবে।

আঞ্চলিক উন্নয়ন

আঞ্চলিক আর্থিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ উন্নয়ন নীতির আর এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় হইতে উন্নত অঞ্চলের উন্নয়নের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। ঐ সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইহারও কতকগুলি কারণ আছে। প্রথম কথা হইল ক্ষুদ্র শিল্পের ফলে অধিক কর্মস্থান হইবে, দ্বিতীয়তঃ দেশের আর্থিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজকর্মের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন আবশ্যক, তৃতীয়তঃ ইহাতে মূলধনীদের সংখ্যা বাড়িবে। যাহা হউক আর্থিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের একটা বিশেষ স্থান আছে এবং ইহার গুরুত্ব স্বীকার্য।

ভারতে আর্থিক উন্নয়নের যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা নির্ভুল এবং ইহা দ্বারা ভারতের ঘোষিত লক্ষ্য সাধন সম্ভব হইবে। এই নীতির মূল ধারণা শুধু যে সুদৃঢ় তাহা নয়, ইহার মধ্যে সাফল্য জাহির করিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই।

মনে রাখিবেন—

বিশুদ্ধ সরিষার তৈল স্নেহজাতীয় পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণে সমৃদ্ধ এবং সেবনের পর যথাসম্ভব কম অ্যাসিড ষ্টিমু করে

ডাক্তারগণ বলেন, সর্ব্বমঙ্গলার "রাধাবিনোদ মার্কা" তৈল ২ একমাত্র বিশুদ্ধ তৈল ও স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনরূপ ক্ষতিকর নহে।

—ঃ সকল উৎসবে, স্বাস্থ্যে ও সেবায় ঃ—

যৌথ কোম্পানী প্রসঙ্গ

দি ন্যাশনাল সুগার মিলস লিমিটেড

বার্ষিক বিবরণী ও অগ্রগতির ইতিহাস

দি ন্যাশনাল সুগার মিলস্ লিমিটেড ১৯১৪ সালে স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯৫৫ হইতে ১৯৬১ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে যে অগ্রগতির ইতিহাস রচনা করিয়াছে তাহা বাঙ্গালীর শিল্পের পক্ষে বিস্ময়ের বিষয়। এ পর্যন্ত কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ১ কোটির টাকার মধ্যে ৭২ লক্ষ টাকা বিলিকৃত হইয়াছে এবং তাহা ছাড়াও ৭৩,২২৭ টাকা পেয়ার বাবদ জমা আছে। কোম্পানীর প্রাথমিক অনুমোদিত মূলধন ছিল মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার আরও ৩০ লক্ষ টাকা পেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানটি সংগঠন কার্যে ব্যাপৃত ছিল। বীরভূম অঞ্চলের শুষ্ক জমি উন্নয়ন, জল সরবরাহের ব্যবস্থা, পথঘাট নির্মাণ, কারখানার যন্ত্রপাতি সংস্থাপন ও ইক্ষুচাষে উৎসাহ দান প্রভৃতি তাহাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাসে কারখানাটির উদ্বোধন হয়। এ পর্যন্ত কোম্পানীর উন্নয়ন খরচ বাবদ ৯ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। কোম্পানীর বর্তমান চলতি ও স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ৮৪,৯১,০০০ টাকা।

১৯৫৯-৬০ সালে কোম্পানীর প্রারম্ভিক উৎপাদন শুরু হয়। এই সময়ে মাত্র ৯ দিন কাজ হয় এবং ২১ হাজার মণ ইক্ষু পেষণ করিয়া ৮ হাজার মণ চিনি উৎপাদিত হয়। ঐ কয়দিন উৎপাদনের ফলে কোম্পানীর লাভ হয় ১৬,১৭৫ ২ টাকা। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬০-৬১ সালে মিলটি পুরা সময়ের জন্য কাজ করিতে সক্ষম হয়। ৯ই ডিসেম্বর হইতে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত এই চার মাস কাজ করিয়া এই মিলটি ৭৯,০০০ মণ চিনি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। ইক্ষু পেষণের অনুপাতে চিনি প্রাপ্তির হার ৯·৮৫ শতাংশ। এই হার চিনি উৎপাদনকারী রাজ্যসমূহ—যথা, দক্ষিণ ও উত্তর বিহার, পূর্ব ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উড়িষ্যা ও আসামের তুলনায় সর্বাধিক। ১৯৬১-৬২ সালে এই হার আরও সন্তোষজনক হইবে বলিয়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গ মনে করেন। তাঁহাদের মতে আগামী মরশুমে ১৩ হইতে ১৪ লক্ষ মণ ইক্ষু পেষাই করা সম্ভব হইবে।

মাথা ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করে

বেঙ্গল কেমিক্যালের

গোল্ডেন আমলা হেয়ার অয়েল

কেশচর্যা ও কেশচর্চার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। বর্ণে, গন্ধে ও গুণে অতুলনীয়।

আজই ব্যবহার আরম্ভ করুন। সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা·বোম্বাই·কানপুর

পশ্চিমবঙ্গ চিনি সরবরাহের ব্যাপারে এখনও ঘাটতি অঞ্চল। এই রাজ্যের বাৎসরিক প্রয়োজন ২ লক্ষ ৫৪ হাজার টন। এই রাজ্যে অবস্থিত ২টি মিলে মোট উৎপাদন মাত্র ২৬ হাজার টন। ভারতে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও পশ্চিমবঙ্গ একান্তই পরনির্ভরশীল। প্রতি বৎসর এই রাজ্যকে ২৫ কোটি টাকার চিনি অন্য রাজ্য হইতে ক্রয় করিতে হয়।

আমরা পূর্বেও বলিয়াছি বাঙ্গালী শিল্প বিমুখ একথা সত্য নহে ন্যাশনাল মিলস্ লিমিটেডের অগ্রগতি তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে। এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী এন. এন মিত্র চিনি শিল্প সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁহার তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গের চিনি সরবরাহের সমস্যা সমাধানের এক উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবে আমাদের বিশ্বাস।

——:::০:::——

ভারতে জীবনবীমার অগ্রগতি

জীবনবীমা কর্পোরেশনের নূতন কাজ ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি

১৯৫০ সালের রিপোর্ট প্রকাশ

জীবনবীমা কর্পোরেশনের চতুর্থ বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯৬০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরে নূতন কাজের পরিমাণ পূর্ব বৎসরের তুলনায় ১৮·১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পলিসির সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৭·১৩ লক্ষ এবং বোনাস সমেত বীমার পরিমাণ দাঁড়ায় ২,২৮৪ কোটি টাকা। বীমার পরিমাণে ১৯৫৯ সালের তুলনায় ৩২৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কর্পোরেশনের জীবন-বীমা তহবিলের পরিমাণ এক্ষণে দাঁড়াইয়াছে ৫৬·৩৮ কোটি টাকা অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের তুলনায় ৫৫·৬৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬০ সালের জীবনবীমা কর্পোরেশনের বিভিন্ন ধরণের লগ্নীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৩·৬২ কোটি টাকা; ১৯৫৯ সালে ছিল ৩৫·০৪ কোটি টাকা।

রিপোর্টে জীবনবীমা কর্পোরেশনের সাংগঠনিক সম্প্রসারণ, বেতন সাম্রত পরিকল্পনা ও সুপার এনুয়েশন পরিকল্পনা প্রবর্তন, নাগপুরে পরিচালন কর্মচারীদের জন্য শিক্ষণ কলেজ স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন ধরনের পলিসি

রিপোর্টে ১৯৬০ সালের বিভিন্ন ধরনের পলিসির কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, এই বৎসর যে সব পলিসি ইস্যু করা হয় তন্মধ্যে সমগ্র জীবনমেয়াদী পলিসির মাত্রা ৮·২৬ শতাংশ এণ্ডাওমেন্ট পলিসি ৪৬·১৭ শতাংশ, যৌথ জীবনবীমা পলিসি ৬·৫৬ শতাংশ, শিশু-বীমা ৭·৮৩ শতাংশ এবং বিবিধ পলিসি ১০·৪৮ শতাংশ।

পলিসি পিছু গড়পড়তা বীমার পরিমাণ ভারতে ৩৮৭১ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩,৯০৩ টাকা দাঁড়ায় এবং বিদেশে ১১৯৬৯ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১,২৫৩৯ টাকা দাঁড়ায়।

আয় ও ব্যয়ের মাত্রা

রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৬০ সালে প্রিমিয়াম বাবদ কর্পোরেশনের আয় হইয়াছে ১৮·৩৯ কোটি টাকা; ১৯৫৯ সালে আয় হইয়াছিল ৮৪·৪১ কোটি টাকা। জীবনবীমা তহবিল বাবদ কর্পোরেশন সামুলো শতকরা ৪·৫৮ টাকা হারে সুদ পাইয়াছে, পূর্ব বৎসর ইহার হার ছিল শতকরা ৪.৫৪ টাকা। ১৯৬০ সালে অবশ্য আয়কর প্রভৃতি বাদ দিয়া নীট সুদের হার দাঁড়ায় শতকরা ৩·৫৫ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে কর্পোরেশনকে পলিসি বাবদ দাবী মিটাইতে ব্যয় করিতে হয় ৩০·৬৯ কোটি টাকা। ১৯৫৯ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ২৮·১৪ কোটি টাকা। ১৯৬০ সালে সমগ্রভাবে ব্যয়ের হার দাঁড়াইয়াছে ২৮·৪ শতাংশ, ১৯৫৯ সালে ছিল ২৮·৭ শতাংশ। কর্মচারীদের [illegible] মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধিরফলে অতিরিক্ত ব্যয়ের হার আরও কম হইয়াছে। [illegible]

হাজারীপাড়া চাঙ্গড়ভাঙ্গী—কলাকান্দি

দ্রুততর ডাক

চিঠিপত্র তাড়াতাড়ি বাছাই ক'রে যাতে দ্রুত ডাকবিলি করা যায় সেজন্য বড় বড় সহরগুলিকে সাধারণতঃ ডাক বিলির অঞ্চলে ভাগ করা হয়। সম্পূর্ণ ঠিকানা লিখে এবং অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে আপনার চিঠিপত্রের গতি দ্রুততর করুন।

আপনি যখন চিঠি লেখেন তখন আপনার নিজের ঠিকানায় দয়া করে *আপনার* ডাক বিলির অঞ্চল সংখ্যা দিয়ে দিন।

অঞ্চল সংখ্যায়

ঠিকানা সম্পূর্ণ হয়

আপনাদের আরও সেবা করতে আমাদের সাহায্য করুন

ডাক ও তার বিভাগ

DA 60/177

ইকনমিক স্টাডিজ্ এণ্ড জার্নালস্ প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীখগেন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক আর্থিক প্রসঙ্গ প্রেস, ২, প্রাইভেট রোড, কলিকাতা-২৮ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীবিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আহারের পর দিনে দু'বার..

সব খাতুতে স্বাস্থ্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

দু' চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চা. চামচ দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দ্দি, কাশি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্দ্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদ-আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

লিলির

রিচ

নোনতা

বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং.প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪